মৃত্যুপথের যাত্রী

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

প্রথম প্রকাশ
১লা জানুয়ারী, ১৯৬১

এক

ঢং ঢং ঢং—মাঝরাতের জমাট অন্ধকারের বুক চমকে দিয়ে এলাহাবাদ সেণ্ট্রাল জেলের ঘণ্টা-ঘড়ীতে বারোটা বেজে গেল।

সারা সহর নিস্তব্ধ। জেলখানার প্রতি কক্ষে কয়েদীর দল সারাদিনের পরিশ্রমের পর গাঢ় ঘুমে অচেতন। কেবল প্রবেশ দ্বারের লৌহ-ফটক বন্ধ করে, তার ভিতরে দু'জন সঙ্গীন-ধারী প্রহরী সজাগ হ'য়ে বসে আছে। এদের পালা রাত একটা পর্যন্ত। তার পরেই অপর দু'জন কনষ্টেবল্ এদের স্থান অধিকার করবে। জেলখানার এই কঠোর নিয়মের এক চুল ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই—অন্ততঃ যতদিন আমি এখানকার ভারপ্রাপ্ত 'জেলার' বা জেল-রক্ষক।

জেলখানার বাইরে, ফটকের ঠিক সুমুখেই জেল-অফিস আর পুলিসের থানা। তার ও-পাশেই আমাদের কোয়ার্টার। আমার এ্যাসিস্টাণ্ট রামশরণ চৌবে অন্য দিন নাইট ডিউটি করে থাকেন, কিন্তু আজ আমি ইচ্ছা করেই তাকে ছুটি দিয়েছি। নাইট ডিউটি আজ হ'চ্ছে আমার—কারণ, তাতে আমার একটু প্রয়োজন আছে।

আজ ২৩শে এপ্রিল। আজকের রাতটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত দস্যু-সর্দ্দার তেজশঙ্কর ফাঁসি-কাঠে ঝুলবে, পৃথিবীর বুক থেকে একটা নিষ্ঠুর দুর্ব্বৃত্তের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য মুছে যাবে। সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ সেই সুসংবাদ শোনবার জন্য রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

তেজশঙ্কর বিখ্যাত দস্যু—তেজশঙ্কর মহা দুর্দ্ধর্ষ। দস্যু হ'লেও সে একজন সাধারণ দস্যু নয়,—দস্যু-সম্রাট্। সারা বাংলা আর বিহার প্রদেশে যতগুলি গুপ্ত দস্যুদল আছে, তেজশঙ্কর সেই সব দলের দলপতি। তার নামে পুলিসের মুখ চূণ হয়ে যায়—রাজপুরুষদের বুক কেঁপে ওঠে। এই মহাপ্রতাপশালী দস্যু-সর্দ্দারকে বাংলা দেশের সরকার-পক্ষ বহু দিন ধরে বহু চেষ্টাই করে এসেছেন—কিন্তু সবই বৃথা হয়েছিল। তা'কে ধরা তো দূরের কথা, উপরন্তু তার হাতেই বিস্তর পুলিসকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

তেজশঙ্কর নামজাদা নরহন্তা; বড় বড় ধনী মহাজন, রাজা আর জমিদারের উপরেই তার যত আক্রোশ। বিস্তর ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিকে সে নির্ম্মমভাবে হত্যা করে এসেছে। দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে এ[illegible]টি প্রদেশের বুকের উপরে মহা দর্পের সঙ্গে সে চালিয়ে এসেছে তার অত্যাচারের রথচক্র—কিন্তু এতকালের মধ্যে কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু অদৃষ্টের চাকা এবার খুব অদ্ভুত রকমেই ঘুরে গেছে। বনের দুর্দ্দান্ত সিংহ তাই আজ এসে ঢুকেছে মানুষের কারাগারে। আজ আর সে শৌর্য্য-বীর্য্য নেই। সে এখন বন্দী—সে এখন ফাঁসির আসামী।

তার শেষ বিচারের দিন এলাহাবাদের হাইকোর্টে লোক আর

ধরে না। কোর্টের বাহিরে, পথের দুই ধারে লোকে লোকারণ্য। কত দূর-দূর থেকে কত রকমের লোক এসেছে তাকে দেখতে। তার বিচারের ফলাফল জানবার জন্যে কি তাদের উৎসাহ! কি উৎকণ্ঠা। ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়ার পর তাকে সেই ভিড় ঠেলে জেলখানায় ফিরিয়ে আনাই কঠিন হয়ে পড়েছিল।

কাল ভোরে তার সেই ফাঁসির দিন। আজকের রাতটাই তার জীবনের শেষ রাত। আজ রাতেই তাই তার সঙ্গে আমায় দেখা করতে হবে—তার সেই লোহার ডাণ্ডাঘেরা হাজত-ঘরের মধ্যে। এ যেন সিংহের খাঁচার ভিতরে ঢোকা,—সিংহের সঙ্গে কোলাকুলি করতে।

কাজটা দুঃসাহসের বটে—কিন্তু তবু তা আমাকে করতেই হবে। এরই জন্যে রামশরণ চৌবেকে ছুটি দিয়ে নিজেই এই 'নাইট ডিউটির' ভার নিয়েছি।

তেজশঙ্কর দস্যু, তেজশঙ্কর দেশবাসীর আতঙ্ক, তেজশঙ্কর নর-সমাজের শত্রু। তবু আমার কাছে মোটেই সে একটা বিভীষিকা নয়। সে যে কে, এবং কি, তা আমি ঠিক জানি না; কিন্তু তবু সে আমার একজন আপনার লোক।

তেজশঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় দুই-এক দিনের নয়—কয়েক বৎসরের। অথচ এর আগে তাকে আমি চক্ষেও কখনো দেখিনি; আমার পরিচয় ছিল তার নামের সঙ্গে আর তার এমন কতকগুলো বিশেষত্বের সঙ্গে, যা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে, অনেক বিচার-বিবেচনা করেও আমি কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারিনি।

তবু আমি জানতাম যে দস্যু-সর্দার তেজশঙ্কর একটা অতি অসাধারণ লোক। মানুষের সমাজ দীর্ঘকাল ধরে তার এই নৃশংস

বৃত্তির বিরুদ্ধে যত কিছু ঘৃণিত মন্তব্য প্রচার করে আসুক না কেন, তবু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না যে, সে বাস্তবিকই এই সব কুৎসার উপযুক্ত। তাই সর্ব্বসাধারণের কাছে সে যখন নিষ্ঠুর নরঘাতক দস্যু, আমার ধারণায় সে তখন সেই বাহ্যিক পিশাচের ছদ্মবেশে একজন পরম দয়াল, দীন-দুঃখীর পরম উপকারী বন্ধু—অসহায়, অনন্যোপায় গরীব লোকদের মা-বাপ।

ফাঁসির আসামী তেজশঙ্করের সম্বন্ধে আমার এই উচ্চ ধারণা জন্মেছিল অনেক বৎসর আগে, যখন আমি কলেজের ছাত্র, আর যখন মাত্র অল্পকাল পূর্ব্বে আমার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হয়েছিল। তার আগে এই দস্যু-সর্দ্দারের নাম, সর্ব্বসাধারণের মত আমারও কাছে অতি ঘৃণার বস্তু ছিল।

খঞ্জনপুরের মৃত রায়বাহাদুর শশিশেখর ঘোষালের কন্যা অনিতাকে আমি বিবাহ করি। বিবাহের পর হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম তার এক মহানুভব ধর্ম্মভায়ের নাম। ভগ্নীর শুভ বিবাহে দাদার আশীর্ব্বাদের উপহার বলে সেই ধর্ম্মভাই নাকি এক জোড়া জড়োয়ার ব্রেসলেট্, আর গলার একছড়া জড়োয়ার নেক্লেস্ তাঁকে পাঠিয়েছিল। আমার স্ত্রী অনিতা অতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে সেগুলি ব্যবহার করত।

জিনিস দুটোর দাম দশ হাজারের কম কিছুতেই নয়। অথচ এত দামী যৌতুক দেওয়াব প্রতিশ্রুতি কন্যাপক্ষের একেবারেই ছিল না। কাজেই এই মহামূল্য অলঙ্কারগুলি আমাদের বাড়ীর সকলেরই মনে বিস্ময়ের হিমালয় রচনা করে তুলেছিল। সকলেই বলাবলি করত, "কথা না থাকলে এমন দামী গয়না কেউ কখনো দেয় নাকি!"

খঞ্জনপুরের ঘোষালরা অতি সম্ভ্রান্ত বংশ। নবাবী আমলে তাঁরা ছিলেন প্রকাণ্ড জমিদার—যদিও বর্ত্তমানে তাঁদের ততবড় জমিদারী আর নেই; তবু ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে বনেদী বংশ বলে বিশেষ একটা খাতির তাদের আছে।

আমি অনিতাকে বিয়ে করেছিলাম কেবল তাদের সেই বংশ-পরিচয়ে,—যৌতুকের লোভে নয়। কারণ, যৌতুক তাঁরা যা দিতে চেয়েছিলেন, তার দাম দু'হাজারের বেশী মোটেই নয়।

কিন্তু দু'হাজারের উপর আবার দশ হাজার টাকার গয়না! কাজেই সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছিল অনেক, কিন্তু সন্তোষজনক কারণের সন্ধান কিছুই পাওয়া যায় নি। এইটুকু শুধু জানা গিয়েছিল যে, ওই অলঙ্কারগুলি অনিতার শুভ বিবাহে প্রদত্ত তার ধর্ম্মভায়ের প্রীতি-উপহার।

কিন্তু কে সে ধর্ম্মভাই? কত বড়লোক সে? একটা ধর্ম্ম-সম্পর্কের খাতিরে দশ হাজার টাকা যে উপহার-স্বরূপ দান করতে পারে, সে যে একজন কোটীপতি, তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু অনিতার কাছে জানলাম যে, সে ধনবান্ মোটেই নয়—সে একজন আশ্রয়হীন গরীব। চালচুলো তার কোথাও নেই। থাকে সে এখানে-সেখানে, বনে-জঙ্গলে, গাছতলায়,—তাও যে কখন কোথায়, কেউ তা বলতে পারে না।

হেঁয়ালী মন্দ নয়। কাজেই সেই অসাধারণ ধর্ম্মভায়ের পরিচয় পাওয়ার জন্যে ঔৎসুক্য হয়েছিল খুবই। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও তার নামটি ছাড়া অনিতার কাছে আর বেশী কিছু পাওয়া গেল না। শুনলাম, তার আসল নামটা বোধ হয় আজকালকার

কেউই জানে না।—অনিতাও নয়। তবে "দয়াল দাদা" নামে সে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, এমন কি ভারতবর্ষের অন্য অনেক স্থানেও সুপরিচিত—বিশেষ করে সেই সব দেশের যত দীন-দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ উৎপীড়িত লোকদের কাছে।

বিস্ময় বাড়লো বই কমলো না। উপরন্তু একটা দারুণ অনুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌লো এই রূপকথার অপরূপ চরিত্রটাকে কেন্দ্র করে। স্থির করলাম, জানতেই হবে কে সেই অদ্ভূত লোক, যে বাস করে বনে-জঙ্গলে, গাছতলায়—তাও কখন যে কোথায়, কেউ তা জানে না—বিলোয় হীরে, মাণিক, রত্নরাজি! দেশ-বিদেশে সুপরিচিত, অথচ কেউ জানে না সে লোকটা কে?

বি, এ, পরীক্ষা দিলাম বিয়ের মাস চারেক পরেই। তারপর দেশ-ভ্রমণের ছল করে বেরিয়ে পড়লাম দয়াল দাদার অনুসন্ধান করতে। আমার উদ্দেশ্যের কথা কাউকে জানতে দিলাম না,—অনিতাকেও নয়।

মৃত্যুপথের যাত্রী

"মা উঠুন ! ভয় কি ?

দুই

প্রথমেই গেলাম খঞ্জনপুর। শ্বশুরালয়ে প্রবীণ পুরুষ কেউই নেই! বিধবা শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীই সংসারের অভিভাবিকা! স্পষ্টভাবে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় নি। তবুও প্রকারান্তরে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছিলাম।

প্রশ্নটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটি গম্ভীর হয়ে এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠলো। দেখলাম এক পরিপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি! সন্তানের শুভকামনার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাতৃ-আশীর্ব্বাদের পূর্ণ রূপ তাঁর চোখে ও মুখে ফুটে উঠেছে।

অল্পক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থেকে তারপর ধীরে ধীরে কোমল উপদেশের স্বরে তিনি উত্তর দিলেন:

"বাবা! তুমি ছেলেমানুষ। লেখাপড়া শিখেছ—তাই করে যাতে দশজনের একজন হতে পারো, তারই চেষ্টা করে যাও। ওসব ঘরছাড়া, পথহারা লোকের পরিচয় জেনে তোমার উপকার কিছুই হবে না। দয়াল যেমনই হোক, সে আমার ধর্ম্মছেলে; কিন্তু আমার নিজের ছেলে থাকলেও দয়ালের চেয়ে সে বোধ হয় আমার বেশী প্রিয় হ'তো না।

চৌদ্দ বছরের সেই হতভাগ্য ছেলেটিকে তার বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজনেরা অত্যাচার করে তাড়িয়েছে, জ্ঞাতিরা উৎপীড়নের অন্ত রাখে নি, দেশের লোকেরাও অবিচার করেছে যতদূর সম্ভব।

মানুষের সমাজে ঠাঁই তার মেলে নি, তাই প্রাণের জ্বালায় ছুটে

বেরিয়েছিল সে অনির্দ্দিষ্টের পানে। স্নান করতে গিয়ে আমাদের গ্রামের পাশের নদীর তীরে একটা তালগাছের তলায় তাকে পেয়েছিলাম মরণাপন্ন অবস্থায়।

ছ'বছর সে ছিল আমার কাছে, আমার ছেলের স্থান অধিকার করে। সেই অল্প কয়টি বছরেই মায়ের চোখ দিয়ে দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, দয়াল আমার সাধারণ ছেলে নয়। তার ভেতর একটা অতি-মানুষের মহাপ্রাণ কোনোরকমে আত্মগোপন করে আছে। আমার কাছে এই সব সাধারণ বাঁধনে বাঁধা পড়তে সে আসে নি—বাঁধা সে থাকবে না। তার ভেতরকার অতিমানুষটি একদিন না-একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তাকে কোথায় কোন্ তেপান্তরের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে!

হলোও তাই। কুড়ি বছর বয়সে, যেমন অতর্কিতে সে এসেছিল, তেমনি অতর্কিত ভাবে চলে গেল। সে আজ ৯।১০ বছরের কথা। সেই থেকে আমরা তার কোন সন্ধান পেতাম না বটে, কিন্তু আমাদের সকল খবরই সে রাখতো।

এ কথাটা জানলাম আজ হতে বছর-সাতেক আগে। ওঃ! সে কি এক ভীষণ দিনই গেছে! আমাদের পরম শত্রু গোবিন্দলাল আমাদেরই যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে হয়ে উঠেছে একজন মহা ধনবান লোক—তবু আমাদের উপর আক্রোশ তার মেটে নি।

অনেক টাকা ব্যয় করে সে একটা প্রকাণ্ড গুণ্ডার দল তুলেছিল আমাদের সর্ব্বনাশ করতে। সেদিন অমাবস্যা—আকাশ-জোড়া জমাট মেঘের নীচে পৃথিবীর বুক কাকের প মত কালো হয়ে উঠেছে। তার উপরে টিপ্ টিপ্ করে

পথে, ঘাটে, লোকের বাড়ীতে মানুষের সাড়া-শব্দ একেবারেই নিভে গেছে। দুপুর রাতে হঠাৎ কি চীৎকার! আর কি ভয়ানক দরজা ভাঙ্গার দমাদম শব্দ! "রে রে রে, মার্ মার্" প্রভৃতি হুঙ্কার শুনে সকলেরই গায়ের রক্ত জল হয়ে আসতে লাগলো। ভাবলাম—ডাকাতের হাতেই বুঝি আমাদের ধনপ্রাণ তুলে দিতে হবে!

অনিতাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে একটা ছোট ঘরের অন্ধকারের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম…কতক্ষণ তা জানি না। হঠাৎ একটা "মা! মা!" ডাক কানে যেতেই চৈতন্য ফিরে এল। চোখ চাইতেই দেখলাম, আমার সেই ঘরটা একটা জ্বলন্ত মশালের আলোয় আলো হয়ে উঠেছে, আর সেই আলোয় আমার ঠিক সুমুখেই এক অপূর্ব্ব সাজে সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সেই ধর্ম্মছেলে।

দয়ালের কোমরে একটা গাঢ় লাল রঙের জাঙ্গিয়া আঁটা, মাথায় একটা চক্‌চকে লোহার গড়া পাগড়ী, কোমরে প্রকাণ্ড একটা ছোরা আর ডান হাতে বর্শা। হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে সে বললে,—

অ। "মা! উঠুন। ভয় কি? আপনার দয়াল বেঁচে থাকতে বেশীনার ওপর অত্যাচার করে বেঁচে যাবে এমন দশটা মাথা আছে ? গোবিন্দলালের অর্দ্ধেক দল সাবাড় করে দিয়েছি, অর্দ্ধেক স্বজকষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। এখন একবার উঠুন মা! অনেক-নি, রে আপনাকে একটা প্রণাম করি।"

দয়ালকে দেখে আর তার কথা শুনে মরা দেহে যেন জীবন

ফিরে পেলাম, কিন্তু বিস্ময় বেড়ে উঠলো খুবই। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতখানি সস্নেহে ধরে জিজ্ঞেস্ করলাম—

"এ কি! দয়াল? সত্যিই তুই? এতকাল পরে হঠাৎ এই বিপদের সময়ে কোথা হতে এসে পড়লি বাবা? গোবিন্দলালের কথাই বা কি বল্‌ছিস্? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা!"

দয়াল হাসলো। বল্লে:

"বুঝবেন কি করে মা! এত সব ষড়্‌যন্ত্রের কথা আপনার বুঝা অসাধ্য, কিন্তু তবু এইটুকু জেনে রাখুন—আজকের এই ভয়ানক আক্রমণ সেই গোবিন্দলালেরই কীর্ত্তি। গুণ্ডার দল জুটিয়ে সে এসেছিল আপনাকে আর অনিতাকে খুন করতে। কিন্তু সে হতভাগা জানে না যে, দস্যু-সর্দ্দার তেজশঙ্করের চর সর্ব্বত্রই আছে। তার চোখে ধুলো দেওয়া মানুষের সাধ্য নয়।"

বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। দয়াল বলে কি! সে কি তবে দস্যুর দলে নাম লিখিয়েছে? সে কি সেই বিখ্যাত ডাকাতের দলভুক্ত? ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞেস্ করলাম:

"তেজশঙ্কর? সেই নামজাদা ডাকাত-সর্দ্দার? কি বলছিস্ তুই দয়াল? সেই ডাকাতের দলই কি আমাদের আজ বাঁচালে?"

দয়াল এবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো। উত্তর করলে—

"হ্যাঁ, মা। সে আজ নিজে এসেছে তার কথঞ্চিৎ ঋণ শোধ করতে। পাপিষ্ঠ গোবিন্দলালের মুণ্ডটা সে নিজের হাতেই তার ধড় থেকে পৃথক করে দিয়েছে। আপনার উপর আর কোন অত্যাচার সে

করতে পারবে না। এখন বলুন মা! তেজশঙ্করের মাতৃঋণের এক কণাও কি এতে শোধ হয় নি?”

কি উত্তর দেব, তা বুঝতে পারলাম না; কারণ, তার কথাগুলো তখনও আমার মনে হচ্ছিল যেন হেঁয়ালী! শেষে সে-ই অল্প দু'চার কথায় আমার সন্দেহ মোচন করে দিলে। তারপর আমাকে প্রণাম আর অনিতাকে আশীর্ব্বাদ করে ঝড়ের মত সে উধাও হয়ে গেল!

সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তার আর সাক্ষাৎ পাই নি। কিন্তু তার অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা নিত্য-নতুন বর্ণনার রূপ ধরে সারা দেশবাসীর ও সেই সঙ্গে আমারও কানে এসে বাজছে। সবাই সমস্বরে বলছে—তেজশঙ্কর একটা মহাপাপী, তেজশঙ্কর খুনে, তেজশঙ্কর নব-সমাজের মহাশত্রু। কিন্তু আমার সেই ধর্ম্মছেলে দয়াল দেশ-বিদেশের দীন, দরিদ্র, অনাথ, অসহায় আর অত্যাচার-পীড়িতদের 'দয়াল দাদা' হয়ে হাজার হাজার লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি আর আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এ কথা কেবল আমিই জানি।

অনিতা মিথ্যে বলে নি বাবা! আমিও শপথ করে বলতে পারি যে, তার কথার একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। দয়াল যাই করুক, সে নিজের জন্য কিছুই করে না। সে নিজে যেমন হতভাগা ছিল, ঠিক তেমনিই আছে। আগেকার মত আজও মানুষের সংসারে তার ঠাঁই নেই—দেশের লোকের ঘরে তার আশ্রয় নেই। বরং মানুষ-সমাজের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বনে ও জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়ায়—তাও একস্থানে স্থির হয়ে সে থাকতে পারে না। ভোগ নেই, বিলাস নেই, আরাম-বিশ্রামও তার ভাগ্যে কখনো জোটে না, তবু সে হাজার হাজার

লোকের দয়াল দাদা—সে দীন-দুঃখীর মা-বাপ। শুধু এইটুকু জেনে আমি তার সব অপরাধের কথা ভুলে গেছি, তাকে ঠিক আগেকার মত স্নেহের চোখেই দেখে আসছি। অপরাধের মধ্যেও—সে মহৎ, সে মহানুভব।

সে আমার ধর্ম্মছেলে, তবু তার সঙ্গে আমাদের কোন রকম সংস্রবের কথা প্রকাশ করবার নয়। তুমিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিজ্ঞেস না করলে তার কথা কিছুই জানতে পারতে না। এখন যেটুকু জানলে, তাও আমাদের সকলেরই জন্যে তোমাকে গোপন করতে হবে। প্রথমেই তাই বলেছিলাম যে, সে একটা ঘরছাড়া, পথহারা লোক। তার কথা জানবার চেষ্টা না করে তোমার পক্ষে নিজের কাজ করে যাওয়াই কর্ত্তব্য।”

শ্বশ্রূমাতার সব কথা শুনে আমারও যেন কেমন একটা শ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল দয়াল দাদার উপর। লোকটা তা হ’লে বাস্তবিকই অতি অসাধারণ। কিন্তু কেমন করে সে সেই হীন অবস্থা থেকে এতবড় একটা দস্যু-সর্দ্দার হ’য়ে উঠলো, তা আমি কিছুতেই ধারণা করে উঠ্‌তে পারলাম না। আরও বুঝতে পারলাম না যে, তার এই নৃশংস দস্যুতার উদ্দেশ্য কি! সত্যই কি সে এমন অদ্ভুত আত্মপ্রবঞ্চক? সত্যই কি সে আপন ভোগসুখের প্রতি এমন উদাসীন? কেবল মাত্র দেশের দীন-দুঃখীদের সাহায্য করবার জন্যেই কি সে ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এতবড় অপরাধ দীর্ঘকাল ধরে করে আসছে?

যা হোক তখনকার মত দয়ালের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানবার কৌতূহলকে দমন করতে হ’লো। দেশবিখ্যাত দস্যু-সর্দ্দার

তেজশঙ্করই যে সেই দয়াল দাদা, একথা শোনবার পর কারই বা সাহস হ'তে পারে তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে বেড়াতে? সরকারের বিরাট পুলিস-বিভাগ যে-কাজে হার মেনেছে, আমার মত একটা নগণ্য লোকের সাধ্য কি যে, সে-কাজে এক পাও এগোয়? কাজে-কাজেই শ্বশ্রূমাতার উপদেশ মেনে নিয়ে নিজের কাজে মন দিতে হ'লো।

এর দু'বছর পরেই ঢুকলাম চাকরীতে। পুলিশ-বিভাগে মাথা গলিয়েই পদোন্নতির পর পদোন্নতি। শেষে আরও দু'বছর যেতে না যেতেই হয়ে গেলাম এলাহাবাদ সেণ্ট্রাল জেলের 'জেলার'।

দিন যায়। দেখতে দেখতে আমার চাকরীর চার বছর হয়ে গেল। এর মধ্যে তেজশঙ্করের অনেকগুলো লোমহর্ষণকর নৃশংস ডাকাতি আর নরহত্যার কাহিনী আমার কানে এসেছিল। সারা দেশের ধনিক মহলে পড়ে গিয়েছে একটা মহা আতঙ্কের সাড়া। পুলিস-বিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারীদের চক্ষু একেবারে ঘোলাটে হয়ে গেছে! তারা না পারে কোন কিছু কিনারা করতে, না পারে কৈফিয়ৎ দিতে।

এদিকে ছোট-বড় সব রকমের খবরের কাগজগুলিতে জ্বালাময়ী ভাষায় তুফান বয়ে গেল! যতই বড় বড় লোকের হত্যাকাণ্ড ঘটে, ততই তাদের আস্ফালন বেড়ে যায়। বড় বড় শব্দ আর লম্বা লম্বা বক্তৃতার সাহায্যে তারা প্রত্যেক বীভৎস ঘটনাকে শতগুণ বীভৎস করে তোলে, আর সেই সঙ্গে পুলিস আর সরকারকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অতিষ্ঠ করে দেয়!

রংপুরের রাজা-উপাধিধারী জমিদার দুর্গাশঙ্কর চৌধুরীর হত্যা,

ময়ূরভঞ্জের কোটীপতি মহাজন হরদেওলাল গিধাড়িয়াকে খুন করে তার পঞ্চাশ হাজার টাকা লুট প্রভৃতি গোটাকতক বড় বড় ঘটনা নিয়ে শুধু সংবাদপত্রওয়ালারা কেন, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জনসাধারণ এবং সেই সঙ্গে পুলিস-মহলের পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা একরকম ঘুচে গেল!

আমি নিরীহ মানুষটির মত জেল সীমানার মধ্যে থেকে জেলের গুয়ার্ডার আব কয়েদীদের নিয়ে ডিউটি বজায় রাখি আর শুনে যাই দয়াল দাদার নিত্য-নূতন নৃশংসতার কাহিনী।

ভাব, কি আশ্চর্য্য তাব শক্তি! কি অদ্ভুত সাহস! লোকটা শুধু দস্যু নয়—সে বোধ হয় একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যাদুকর। নইলে এত দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষের নানা স্থানে এমন অত্যাচার করেও নিজের দলবল নিয়ে সে এমন নিখোঁজ ভাবে আত্মগোপন করে থাকে কি প্রকারে?

অবশেষে সরকার বাহাদুরের টনক বেজায় রকম নড়ে উঠ্‌লো। পুলিস ও সি, আই, ডি, মহলে লেগে গেল থরহরি কম্প। চারিদিকে পড়ে গেল সাজ্ সাজ্ রব। হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণাও হয়ে গেল। ধরপাকড় আর খানাতল্লাসী সুরু হলো একদম বেপরোয়াভাবে।

প্রত্যহ দলে দলে লোক আসামী-সন্দেহে ধৃত হয়ে নানা জেলের হাজত-ঘরে পচতে লাগলো। পুলিসের সন্দেহ যে, তারা তেজশঙ্করের গুপ্তদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, না হয় তারা দস্যুদলের সব তথ্য জেনেও গোপন করে যাচ্ছে।

তাদের মধ্যে অধিকাংশ গরীব চাষী, মজুর বা নীচ জাতীয়

তেজ। বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, সাঁওতাল, বুনো—সাহ ভাবে ধরা পড়ে হাজত-ঘরে এসে বস্তাপচা হতে লাগল। তারপর আরম্ভ হ'ল, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নানা রকম চেষ্টা! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিছুতেই তাদের কাছ থেকে তেজশঙ্কর বা তার দলের কোন খোঁজ-খবরই পাওয়া গেল না। তাদের কাছ থেকে এইটুকু শুধু জানা গেল যে, তারা দস্যুপতি তেজশঙ্করের কিছুই জানে না, কিন্তু দয়াল দাদাকে মূর্ত্তিমান্ করুণার অবতার বলেই তারা মনে করে।

দয়াল দাদা তাদের দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, বিপদের বন্ধু, তাদের সকলেরই মা বাপ। দয়াল দাদা কোথায় থাকে, কি করে, তা তারা জানে না, তবু বিপদ আপদের সময়ে তার সাহায্য আসে ঠিক দেবতার দানেরই মত। দয়াল দাদার অপূর্ব্ব দানশীলতা না থাকলে অজন্মায়, দুর্ভিক্ষে, জমিদারের অত্যাচারে ও অন্য অনেক বিপদ-আপদে গরীব দুঃখী লোকদের বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে দাঁড়াতো।

জেলখানার নানা কষ্টে ও মানসিক দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে, বন্দীদের কেহ কেহ মরেও গেল; কিন্তু তবু দস্যু-সর্দ্দার তেজশঙ্কর বা তার দলবলের সম্বন্ধে একটা কথাও কেউ বল্‌ল না।

কে জানে, তার কারণ কি? প্রকৃতই অজ্ঞতা,—না কৃতজ্ঞতা?

তিন

বুঝলাম দয়ার অবতার দয়াল দাদার কি অসামান্য প্রভাব এই সব দীন-দরিদ্র, অসহায় হতভাগ্যদের উপর! অথচ দেশের অত্যাচারী ধনিক সম্প্রদায় তার নামে থরহরি কম্পমান! দস্যুর ছদ্মবেশে এ তবে কেমন লোক?

তেজশঙ্করের সম্বন্ধে তাই একটা উৎকট অনুসন্ধিৎসা জেগে রইলো আমার মনে। লোকটা অসাধারণ অনেক বিষয়েই, কিন্তু সে তার অসামান্য দক্ষতা আর মনোভাব নিয়ে এমন ঘৃণিত পথটাই বা বেছে নিলে কেন? হৃদয়ের বিরাট প্রসারতা নিয়ে এমন হৃদয়হীনতার কাজ যে করে যেতে পারে, তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলুম না।

যাক্। ধরপাকড়, জুলুম সমান ভাবেই চলতে লাগলো। আসল ডাকাতের সন্ধান না পেয়ে, দলে দলে নকল ডাকাতদের চালান দেওয়া হতে লাগলো, তেজশঙ্করের দলস্থ লোক বলে। দেশে-দেশে গরীব, দুঃখী, চাষী, মজুর আর বেকারদের মহলে হাহাকার পড়ে গেল।

এর পরেই হঠাৎ একদিন আশ্চর্য্য ব্যাপার! দেশবিদেশের জনসাধারণ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে বড় বড় হরপে ছাপা হয়ে বেরুলো এক অভাবনীয় সংবাদ! পুলিস-মহলের কি ব্যস্ততা! কি হুলুস্থুল! সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গীনের খোঁচার মত আমার কানে এসে বাজলো দস্যু সর্দ্দার তেজশঙ্করের ধরা পড়বার সংবাদ।

বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হ'লো এটা কাগজ-ওয়ালাদের কারসাজি। তেজশঙ্কর ধরা পড়বে? পুলিসের পক্ষে এতবড় একটা অসাধ্যসাধন কি সম্ভবপর?

সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল ঠিক পরদিনই। বিশ্বস্ত-সূত্রে জানলাম যে তেজশঙ্করকে ধরার সৌভাগ্য কারও হয়নি। সে নিজেই এসে ধরা দিয়েছে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। বহুসংখ্যক নিরীহ লোককে পুলিসের অযথা অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যেই নাকি তার এই আত্মসমর্পণ।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দস্যু-সর্দ্দারের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নীচু হয়ে পড়লো। শ্বশ্রূমাতার সেদিনের সেই কথাগুলি ছাপার অক্ষরে আমার চোখের সম্মুখে যেন ফুটে উঠ্‌লো—"অপরাধী সে হতে পারে;—তবু তার সেই হাজার অপরাধের মধ্যেও সে মহৎ—সে মহানুভব।"

সেই তেজশঙ্কর! সেই আমার স্ত্রী অনিতার দয়াল দাদা—আমার পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীর ধর্ম্মছেলে দয়াল!

যাহোক্ সুদীর্ঘকাল মামলা চল্‌বার পর দস্যুসর্দ্দার তেজশঙ্করের একটা যবনিকাপাত হয়ে গেল। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হ'ল—এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের শেষ বিচারেও তার সাজা অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল।

তেজশঙ্করের ফাঁসি হবে—কাল সেই ফাঁসির তারিখ। ফাঁসির প্রত্যাশায় সে আমাদেরই এই জেলের লোহাঘেরা হাজত-ঘরে বন্দী হয়ে আছে।

হাতে হাতকড়া, পায়ে লোহার বেড়ী আর কোমরে লোহার

শিকল পরা, চার-পাঁচজন সঙ্গীনধারী প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় প্রথম যে দিন তাকে এই জেলে আনা হ'লো, সেইদিনই তাকে দেখে আমি যারপরনাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

একি! এই সেই দস্যু-সম্রাট? ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ, লম্বা-চওড়া চেহারা, বিশাল বক্ষ, পেশীময় বাহু, প্রশস্ত ললাট আর টানা টানা বড় বড় দুটি চোখ—কোন রাজা বা রাজপুত্রেরও এমন সুন্দর আকৃতি হয় কিনা সন্দেহ!

কঠিনতম অপরাধের আসামীস্বরূপ লোহার বাঁধনে বদ্ধ হস্তপদ অপরিহার্য্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার জন্যে হাজত ঘরে যাকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, তার উদ্বেগশূন্য প্রশান্ত মুখশ্রী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। জেলের ভয় সবার হয়তো নাও থাকতে পারে, কিন্তু চরমদণ্ড ফাঁসি তার একমাত্র সুবিচার তা জেনেও এমন অনুদ্বিগ্ন এমন অবিচলিত কেউ থাকতে পারে, সে কথা তখনও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি!

শুনলুম হাইকোর্টের বিচার শেষ হয়ে গেলে, জজ সাহেব গম্ভীর স্বরে আসামীকে যখন তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনিয়ে দিলেন, তেজশঙ্কর তখনও নাকি একদম পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখের সুন্দর রঙ্‌ একটুও বিবর্ণ হয়নি! একটা রেখাও ফুটে ওঠেনি তার কপালে! যেন তার কাছে মৃত্যুদণ্ড একটা দণ্ডই নয়! সে যেন একটা ছেলেখেলা!

বিচার শেষে তাঁকে যেদিন জেল-হাজতে ফিরিয়ে আনা হয়, আমি সেদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলুম। কথায় কথায়

তাকে আমি বলেছিলাম, আমার খঞ্জনপুরের শ্বশুবালয়ের কথা। আমি যে অনিতার স্বামী সে কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তার বড় বড় চোখ দুটো একবার ক্ষণেকের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠে আবার পূর্ব্বের মত স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু সে তা'তে কোন উত্তর দিলে না।

আমি অনেক কথাই বলে গেলাম। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, আর সেই কারণে সরকার তরফের লোক হয়েও তার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা। সব কথা অকপটভাবে বলবার পর আমি তাকে অনুরোধ করলাম তার অপূর্ব্ব জীবনচরিত আমাকে শোনাতে।

সাধারণ গৃহস্থের ছেলে হয়ে, কেমন করে, কিসের জন্যে সে এই দুর্গম পথের যাত্রী হয়ে পড়লো, আর কোন বিচারেই বা সে দেশের ধনিক মহলের সর্ব্বনাশ করে, অসভ্য, অশিক্ষিত, দীন-দরিদ্রের যথাসাধ্য পোষণ করে যেত; আর সবশেষে এই তরুণ বয়সে স্বেচ্ছায় সরকারের হাতে আত্মসমর্পণ করে এমন ভাবে সে তার নিজের মৃত্যুই বা ডেকে আনলে কেন, এইসব অনেক কথাই আমি তার কাছে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

স্থিরভাবে আমার সব কথা শোনার পর একবার সে একটু মুচ্‌কে হাসলে। তারপর বল্লে :

"বুঝেছি তোমার আগ্রহটা সত্যিকারের। আমার সব কথা জানায় যদিও তোমার কোন উপকার নেই তবুও তোমার এমন একটা ঐকান্তিক আগ্রহকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না।

অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই তার এ অনুরোধ আমি মানতাম না। কিন্তু তুমি অনিতার স্বামী—আমার পর নও।

মরতে আমি চলেছি। আমার অপরাধের চরমদণ্ড ফাঁসিই আমার যোগ্য মৃত্যু। এ মরণ আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিচ্ছি—কারণ এই মরণই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

আমার জীবন-রহস্য তোমার কাছে কৌতূহলের বিষয় হলেও তা তোমার শ্রুতি-মধুর হবে না। তবু যখন আগ্রহ তোমার হয়েছে—বেশ তা হলে আজ নয়—কারণ, আমার জগতের সব সম্পর্ক কাটিয়ে চলে যাবার এখনও কয়েকটা দিন দেরী আছে।

আমার ফাঁসির দিন ২৪শে এপ্রিল। তার আগের দিন রাতেই আমি তোমার সব কৌতূহল মিটিয়ে দেব। ২৩শে এপ্রিল রাত দুপুরেই আমি আমার জীবন নাটকের যবনিকা তুলে ধরবো তোমার চোখের সুমুখে। তাতে তুমি সন্তুষ্ট হও—বেশ।"

আজ সেই ২৩শে এপ্রিল। আমি দুপুর রাতের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ চুপ করে পড়ে ছিলাম অফিস-ঘরে একটা আরাম কেদারার উপরে। বারোটা বাজতেই আমি ধীরে-ধীরে উঠে পড়লাম। তারপর জেলখানার ভিতরে ঢুকে, চল্লাম তেজশঙ্করের হাজত-ঘরের দিকে।

দোতলার ঠিক মাঝখানটিতে মোটা মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া অনতিপ্রসর একটা ঘর—লোহার গরাদেগুলোর সুমুখে আবার একপ্রস্থ 'কোল্যাপ্‌সিব্‌ল্' গেট্! হাজত ঘরটি এত সুদৃঢ়

থাকা সত্ত্বেও তেজশঙ্করের মত অসাধারণ আসামীকে তার মধ্যে আটক রেখে নিশ্চিত থাকা চলে না। উপরওয়ালাদের আদেশে তার বদ্ধদ্বারের সম্মুখে তাই একটা সঙ্গীনধারী প্রহরীকে মোতায়েন থাকতে হয়েছে।

লোহার দুয়ার খুলিয়ে বরাবর তার ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। তেজশঙ্কর মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল। আমি যেতেই সে উঠে বসলো। আমার আদেশে প্রহরী একটা পাঞ্চ্‌-লাইট এনে গেটের সুমুখে রাখলে। ঘরের ভিতরটাও তাতে বেশ আলো হয়ে উঠ্‌লো। কয়েদীদের ব্যবহৃত একটা কম্বল মেঝেয় পেতে আমি দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম।

তেজশঙ্কর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তার বড় বড় চোখদুটিতে দস্যুর রুদ্রভাব একেবারেই নেই। কি প্রশান্ত, কি অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি! আমার বোধ হলো যে, সে আমার অন্তরের অন্তস্তলটি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে দেখছে যে সেখানে কৃত্রিমতা বা ছলনা কিছুমাত্র আছে কি না!

বোধ হয় সে আমার ভিতরে আপত্তিজনক কিছুই দেখতে পায়নি, সম্ভবতঃ সে আমার আন্তরিকতায় কিছুমাত্র সন্দেহ করেনি। কারণ, পরক্ষণেই তার মুখটি বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠলো। কোন রকম ভণিতা না করেই সে তার অদ্ভুত জীবনচরিত বলে যেতে লাগলো বেশ ধীর আর গম্ভীরভাবে। আমিও একমনে তাই শুনতে লাগলাম।

চার

তেজশঙ্কর বলতে লাগলো ঃ

বাংলার মধ্যে শক্তিপুর একটা গণ্ডগ্রাম। গ্রামটা বেশ বড় ব'লে ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান মিলিয়ে প্রায় আড়াই-শো ঘর লোকের সেখানে বাস।

গ্রামের মধ্যে আমরা খুব পুরোণো বংশ—যদিও ঘরোয়া বিবাদের ফলে "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই" হওয়াতে বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে কারও অবস্থা তেমন ভাল নয়। তবু বনেদী বংশ বলে গ্রামে আমাদের একটু খ্যাতি আছে।

আমার বাবা ছিলেন ভারী একগুঁয়ে প্রকৃতি আর চড়া মেজাজের লোক। সেই জন্যে গ্রামের অনেকেরই সঙ্গে তাঁর মোটেই বনতো না। ঠিক একঘরে না হ'লেও, পল্লীর গৃহস্থেরা আমাদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করত না।

আমি ছিলাম বাবার প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান। মা মারা যান আমার জন্মের পক্ষকাল পরেই। তারপর তিনমাস যেতে না যেতেই বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। কাজেই আমার সৎমাকেই আমি জেনেছিলাম মা বলে।

শৈশবের কথা বিশেষ কিছু আমার মনে নেই, কিন্তু অল্প জ্ঞান হ'তেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার মা আমার উপর আদৌ সন্তুষ্ট ন'ন—তিনি বরং আমার ছোট বোনটিকেই ভালবাসেন খুব বেশী।

দিনরাত তিনি তাকে নিয়েই ব্যস্ত এবং আমাকেও তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত করে তুলতেন তার জন্য। ক্ষিদের সময় ঠিকমত খাওয়া তো মিল্‌তোই না, উপরন্তু কথায় কথায় ভর্ৎসনা আর শাসন করতেন পুরোমাত্রায়।

বাবা কোথায় কি কাজ করতেন জানি না, তবে তিনি অধিকাংশ সময়ই থাকতেন বাইরে আর তাঁকে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হ'ত। কর্ম্মক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরলেই তাঁকে মায়ের কাছ থেকে কেবলই আমার বিরুদ্ধে অজস্র নালিশ শুনতে হ'ত।

বাবা প্রথমে কিছুকাল তা'তে অবিচলিত ছিলেন, আমাকে দু একটু গালমন্দ বলে চেপে যাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ক্রমাগত নালিশের ফলে তাঁর স্নেহশীল মনটা অবশেষে অনেক পরিমাণে বিগড়ে গেল। কাজেই তাঁর কাছেও আদরের পরিবর্ত্তে অনাদরের ভর্ৎসনা সইতে হতো রোজই।

এইভাবে শৈশব থেকেই আমি স্নেহের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হলুম। অথচ আমার আর আমার সেই একটুখানি বোনটির প্রতি বাবা ও মায়ের ব্যবহারের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি করতে পারতাম। তার নানারকম আদর ও যত্ন আর আমার নিত্য নানা দোষদর্শন, তাড়না, অযত্ন ও কথায় কথায় অনাহার-দণ্ড শৈশব হতেই আমার মনের আলোর রেখাগুলো এক এক করে মুছে দিয়ে তার জায়গায় অন্ধকার এনে ভরে দিতে সুরু করলে।

শিশুর জীবনটি যে কেবল শাসন আর তাড়না, তাতে আনন্দ পাওয়ার মত কিছুই নেই, আছে শুধু পদে পদে কত কি অজানা বিপদের ভয়, এইটুকু উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আর মায়ের

উপর আমার ভালবাসার টান বলতে তো কিছুই রইলো না, অধিকন্তু তাঁরা হয়ে উঠলেন আমার কাছে মহা ভয়ের বস্তু।

পাঁচ বছর পূর্ণ হবার পর হ'তেই পাঠশালায় যেতে সুরু করলাম। কিন্তু সে যাওয়া কেবল একটা নিয়ম রক্ষা করা মাত্র। পড়াশুনার সময় বা সুবিধা মিলতো না বলে পড়া তৈরী আমার কোন দিনই হ'ত না; কাজেই কড়া শাসন সেখানেও আমার নিত্য সঙ্গী হ'য়ে উঠলো।

আগে শুধু ছোট বোনটি ছিল আমার নানা কষ্টের কারণ। কিন্তু পাঠশালায় ভর্ত্তি হবার ঠিক পরেই আর একটি ভাই এসে উদয় হ'লেন আমার নিগ্রহ বাড়াতে। সবে পাঁচ-ছয় বছরের বালক হ'লেও, আমারই স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হ'লো সেই একটুখানি শিশুর পাহাড়-প্রমাণ ভার।

তাকে চৌকি দেওয়া, কোলে নেওয়া, কান্নার সময় ভোলানো, সামলানো—এমন কি অনেক ঘৃণ্য বা আপত্তিজনক কাজও আমার কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়ালো। বোনটির ভার তো আছেই। ফলে পাঠশালার পড়া তৈরী করা আমার দ্বারা আর হয়ে উঠতো না।

ভাগ্যগুণে আমাদের গুরুমশাইটিও ছিলেন একজন কসাই-বিশেষ। তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের জটিলতা দেখে, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি তাঁর মধ্যে বাসা বাঁধতে সাহস করেনি। তাঁর আগ্রহ বিলক্ষণ প্রকাশ পেতো পড়ুয়াদের নিগ্রহের বেলায়। কাজেই পড়ানোর চেয়ে পেটানোর কাজটাতেই তিনি ছিলেন অশেষ দক্ষ।

বাড়ীতে পড়া তো হ'তোই না—খাওয়াও জুটতো না সব দিন,

অবশ্য বকুনি, খিঁচুনি, আর চড়-চাপড় ও কাণমলা ছাড়া; কাজেই কাঁদতে কাঁদতে আর চোখ মুছতে মুছতে অভুক্ত অবস্থায় যেতে হ'তো পাঠশালায়। সেখানেই বা পড়া না হওয়ার কৈফিয়ৎ শুনবে কে? কাজেই খেজুর-ডালের ছড়ি আর কাঁচা কঞ্চির দাগে পিঠ আর কাঁধ ভরিয়ে নিয়ে ক্ষিদে-তেষ্টার কথা ভুলে যেতে হতো।

তাতেই বা নিষ্কৃতি কই? পড়াশুনায় অমনোযোগের অভিযোগ বাবার কানে উঠ্‌তো প্রায়ই। আসল কর্ত্তব্যে কিছুমাত্র লক্ষ্য না থাকলেও অভিভাবকদের কাছে পড়ুয়ার অবহেলার অভিযোগ করাটি গুরুমশাই তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করতেন। তাতে তাঁর সুনাম-বৃদ্ধি তো হ'তোই সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকেরাও তাঁদের ছেলেদের প্রতি মনোযোগী হ'য়ে ওঠবার সুযোগ পেতেন।

গুরুমশাইয়ের নালিশ শুনে বাবা প্রথমে কয়েকটা দিন আমাকে খুব ভর্ৎসনাই করেছিলেন, আর বেশীদূর এগোননি। কিন্তু আমার বিমাতা তাঁকে ক্রমশঃ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন যে, আমি একটা মহা অবাধ্য, অকর্ম্মণ্য, আর বেজায় হিংসুটে ছেলে। আমার গুণ বলতে কিছুই নেই—আছে কেবল নানা দোষ আর রাক্ষসের দৃষ্টি। পড়ায় আমার মন নেই, চেষ্টা নেই, গ্রাহ্যও নেই এতটুকু। আমি একটা কুলাঙ্গার। বংশের নাম ডোবাতেই আমি তাঁদের ঘরে এসে জন্মেছি। আমার নিত্যকার নানা হিংসুটেপনা আর শিশু ভাই-বোনদের উপর অত্যাচারের ফর্দ্দ তিনি বেশ করে বাবার সম্মুখে দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

ক্রমশঃ বাবাও এতে বদ্‌লে গেলেন। তিনি অবাক হয়ে যেতেন আর ভাবতেন—"তাইতো! এই বয়সেই এমন! এ

ছেলে বড় হলে হবে কি? আমাদেরই বুকে হয়তো কোন্‌দিন এ ছুরি বসিয়ে দেবে। কি করা যায় একে নিয়ে?"

কাজেই তাঁকে রীতিমত মনোযোগী হতে হ'তো আমার অমনোযোগ দূর করতে। ফলে ওই অল্প বয়সেই এক একদিন আমার প্রাণ-বিয়োগের উপক্রম হ'য়ে উঠতো।

শৈশব আর বাল্য এই দুটো কালই প্রত্যেক মানুষের জীবনের আসল সুখের আর আনন্দের কাল। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, নিজের দিকে চাইবার কোন প্রয়োজন নেই। সে সবকিছু ভাবনার ভার বাপ-মায়ের—যাঁদেব স্নেহ, যত্ন আর আদর না চাইতেই পাওয়া যায়—'চাই না' বল্লেও নিষ্কৃতি নেই; যেন তা পেতেই হবে, পাওয়া চাই। চাওয়া আর পাওয়া তখন জোরের অধিকার। 'চাই' বল্লেই দিতে হবে, 'পাইনি' বল্লেই বাপ-মায়ের মনঃকষ্ট বাড়ে, তাঁদের ন্যায্য দেনা দেওয়া হয়নি বলে। পৃথিবীটা তখন তার জমিদারী। বাপ-মায়ের স্নেহই তার সে জমিদারী ভোগ করবার বিধিদত্ত সনদ।

সে শৈশব বা বাল্য আমার জীবনে বোধ হয় আসেনি। সে অধিকার আমি পাইনি কোনদিনই। শাসনকেই আমি স্নেহ, আর তাড়না-ভর্ৎসনাকেই যত্ন আদর বলে ভাবতে শিখেছিলাম। বাবা আর মায়ের সংস্রব মধুর ব'লে একদিনও আমার বোধ হয়নি। বরং তাঁদের দেখলেই আমার ভয় হ'তো পাছে আবার কোন অজানা অপরাধের জন্য নিগ্রহ সইতে হয়।

দোষ-গুণ কাকে বলে, ঠিক বুঝতে পারতাম না। যা কিছু করতাম, সবই হতো দোষের। কিছু না করলেও সেটা দোষের

হয়ে দাঁড়াতো। তাই দোষগুণের বিচার করবারও প্রবৃত্তি আসতো না। নিজেকে সংশোধনের কোন ইচ্ছাই হ'তো না আমার মনে। জানতুম দোষ করবোই—তবে না করেই বা নিস্তার কই?

মাঝে মাঝে ভাই-বোন দুটির সঙ্গে আমার নিজের অবস্থার তুলনা মনে জেগে উঠ্‌তো। তাদের আদর-আপ্যায়ন, তাদের প্রতি বাবা-মায়ের স্নেহ-যত্ন, আমার দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। বালক হ'লেও আমি তাতে হিংসা বোধ কখনো করিনি, কিন্তু তবু আমার নিজের ছোট্ট বুকটিতে ব্যথা যে বাজতো না, সে কথা বলতে পারি না। কষ্ট কিছু হ'তোই। কিন্তু গোপনে দু-একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি সে কষ্ট ভোলবার চেষ্টা কবতাম।

কিন্তু দোষ-গুণ বিচাবের পার্থক্যটা আমার সহ্য হ'তো না। তারা বড় রকমের কিছু অন্যায় করলেও, মায়ের চোখে দোষ বলে তা ধবা পড়তো না। এমন কি তাদের অন্যায় কাজের দোষটাও চাপতো এসে আমার ঘাড়ে—অথচ আমি যে কখনো তেমন কাজ কিছু করেছি, সে কথা আমার মনেই পড়ে না।

ক্রমে যেন আপনা হ'তেই আমার মন একটু একটু করে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। বাবা আর মাকে ভয় করতাম খুবই—কিন্তু সে ভয়ও যেন ক্রমেই কমে আসতে সুরু করলে। নিজের প্রতিই আব গ্রাহ্য আসে না, তা ভয়কে গ্রাহ্য করবো কার জন্যে? শাসনের সম্বন্ধ গায়ের সঙ্গে। গায়ের ব্যথার ভয়েই তাকে ভয়। শাসন গা-সওয়া হ'য়ে গেলে তাকে আবার ভয়টা কিসের? শাসন যত বাড়ে, ভয়ও তত কমে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও ততই বাপ-মায়ের উপরে তিক্ত হয়ে উঠতে লাগলো।

পাঁচ

বাল্যটাই মানুষের জীবনের মহা মূল্যবান্ কাল। ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্ব বা পশুত্বের বীজ মনের উর্ব্বর জমিতে বপন করা হয় এই সময়েই। যেমন বীজ বুনবে, পরে ফল পাবে সেই মতই। কিছু না বোনো তো, জমিটা কাঁটা গুল্ম আর আগাছায় ভরে উঠবে। যে জমি যত উর্ব্বর, তাতে ভাল বা মন্দ যেটাই জন্মাক্, জন্মায় তা তত প্রচুর।

আমার মনটা উর্ব্বর ছিল খুবই—কিন্তু অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, তাড়না আর ভর্ৎসনা ছাড়া কোন ভাল ভাবের বীজ তাতে কেউ কোনদিন বুনলে না। স্নেহের স্বরূপ আমি কখনো বুঝতে পাইনি। দয়া, মায়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি যে কি, তা নিজের বুক দিয়ে বোঝবার সুযোগ কেউ আমাকে দেয়নি। জীবনে যা কখনো পাইনি, তা নিজের প্রাণের তহবিলে সঞ্চয় করি কি করে? কাজেই প্রাণটা যতই হাহাকার করে, মনটা ততই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে, বাবা, মা, এমন কি সংসারের সব কিছুরই উপরে।

ক্রমে একটু একটু করে রীতিমত বেপরোয়া হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলাম। কোন কিছুই গ্রাহ্য করতে মন চায় না—নিজের দুঃখ, কষ্ট, প্রহার, অনাহারকেও নয়। যা হয় তা হবে; যা করে, তা করবে; কুছ্ পরোয়া নেই—এই রকম একটা মনোভাব।

তখন বারো পার হয়ে মাত্র তেরোয় পা দিয়েছি। আমারই

বেপরোয়া দুর্ব্বৃত্তপনায় মায়ের অত্যাচার আর বাবার অবিচার প্রত্যহই সীমা ছাড়িয়ে যেতে সুরু ক'রছে। বাড়ীতে থাকতে বড় একটা পারি না—থাকতে দেয়ও না। এখানে সেখানে ঘুরি, আর প্রতিবেশীদের গাছের ফল-মূল খেয়ে পেটের জ্বালা মিটাই।

প্রতিবেশীরা জানে সব, তবু জেনেও কিছু জানতে চায় না। তারা শুধু আমাকে একটা বয়াটে, লক্ষ্মীছাড়া, ডানপিটে বলেই জানে, আর অপরকেও তাই জানায়। কিন্তু এই হতভাগ্য বয়াটে ছেলেটার বাল্য জীবনের গলদটা যে কোথায়, সে-কথাটা কেউ একবার ভেবেও দেখে না। আমার তরুণ জীবনের করুণ ইতিহাসের মসীলিপ্ত পাতাগুলি তাদের চোখের সুমুখেই খোলা পড়ে আছে, তবু কেউ একবার দয়া করে সেগুলো উল্টেও দেখে না।

আমাদের জ্ঞাতিরা সবাই কাছাকাছি বাস করতেন। তবু আমাদের সঙ্গে তাঁদের মেলামেশা এক রকম উঠেই গিয়েছিল। আমাদের ভাল-মন্দ, কোন কথাতেই তাঁরা থাকতেন না। কিন্তু কি জানি কেন, আমার বয়াটেপনায় তাঁদেরও মান-সম্ভ্রম নিয়ে বাস করা দায় হ'য়ে পড়লো।

এত বড় বনেদী বংশের ছেলে এমন দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠ্‌লে ইজ্জত থাকে কি করে? কাজেই তাঁরা সকলে মিলে বাবাকে উত্ত্যক্ত করে তুলতে লাগলেন আমাকে রীতিমত শাসন আর সংশোধন করবার জন্যে। তাঁরা স্পষ্ট বলে দিলেন যে, ছেলেকে আদর আর আস্কারা দিয়ে পরের ক্ষতি করবার অধিকার তাঁর নেই। কাজেই তিনি এর প্রতিকার করতে বাধ্য।

বাবা একেই তো সর্ব্বক্ষণ তাঁর কর্ম্মক্লান্ত দেহে একটা তপ্ত মেজাজ নিয়ে থাকতেন; তার উপরে আমার জন্যে পরের কাছে তাঁর অপমান! তিনি রেগে আগুন হ'য়ে উঠ্‌লেন। খুঁজে পেতে, আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই তো চোরের মার মেরে আধমরা করে ছাড়লেন। তারপর হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে আমাকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখলেন বন্দী করে। আমার মা'ও বাবার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে "মর, যমের বাড়ী যা" ইত্যাদি অসংখ্য মধুর বুলির দ্বারা সম্ভাষণ সুরু করে দিলেন। প্রহারের ব্যথায় আমার চৈতন্য অনেকটা অসাড় হ'য়ে এসেছিল, তাই মায়ের সব গালাগালি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

সেদিন আর কিছু খাইনি। খেতে দিয়েছিলই বা কে? পরের দিন একথালা পান্তাভাত আর একটু নুন মা আমার ঘরে দিয়ে গেলেন। হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বল্লেন—"নেও, গেলো। এত দিন খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলুম, তার কাজ খুব দেখাচ্ছ। এমন করে আমাদের মুখ পুড়িয়ে না বেড়িয়ে ঘরেই মরে পড়ে থাকতে পারো না? তা হ'লেও বুঝতাম যে একটা পাপ বিদায় হ'লো। এখন গেলো। গিলে, আমার মাথাটা কিনে রাখো।"

থালাটা ধপাস্ করে আমার সুমুখে বসিয়ে দিয়ে গজ্ গজ্ করতে করতে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন। আমারও মনটা এত বিষিয়ে উঠ্‌লো যে, সে-কথা আর বলবার নয়।

দোষ না হয় করেছি—যদিও সেটা আমার দোষ বলে মানতে পারি না। তা হ'লেও সে-দোসের সাজা তো বড় কম হয়নি? বাবা হ'য়ে ছেলেকে এত মার কেউ মরতে পারে, তা আমার জানা

জ্ঞান হলে দেখলাম. আমার মাথার কাছে এক দেবীরূপিণী বিধবা আছেন

ছিল না। কিন্তু বাবা তো একটু পরেই বেরিয়ে চলে গেলেন। মা কি তার পরেও আমায় একবার খুলে দিতে পারতেন না। সতীনের ছেলে ব'লে কি আমি তাঁর শত্রু হয়ে জন্মেছিলুম? কই, আমি তো একদিনও তেমন ভাবিনি। দিনের মাঝে একটিবারও যদি তিনি আমার সঙ্গে একটু হেসে কথা কইতেন, তবেই আমি যে কত খুসী হ'তুম!—কিন্তু তা হলো না একটি দিনও!

যা হোক্, অবশেষে নিজের ব্যবস্থা নিজেই আরম্ভ করলুম। ভাতের থালার দিকে ফিরেও না চেয়ে কোনমতে পায়ের বাঁধনটা খুলে ফেল্লাম। তখনো কিন্তু মাথা ঘুরছে, গা টল্‌মল্ করছে। কোন কিছু গ্রাহ্য না ক'রে, দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর "যা থাকে কপালে" ভেবে, বাড়ী ছেড়ে আবার দিলাম দৌড়।

সেই থেকে বাড়ী আর ঢুকিনি—কারণ, সেইদিনই প্রথম জানলাম যে, ও-বাড়ী আমার নয়, ও-বাড়ীর কারও সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্বন্ধ কিছু নেই। মা বলে এতদিন যাকে ভেবে এসেছি, তিনি আমার মা নন—সৎমা। আর বাবা যিনি, তিনিও বিমাতার গণ্ডিতে পড়ে আমার পক্ষে ক্রমেই যেন দুঃসহ হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই ঠিক বুঝে নিলুম, ওঁদের দু'জনের কাছ হতে ছেলের দাবী, ছেলের অধিকার কোনদিনই পাইনি, পাবও না। ওঁদের কাছ থেকে আমার একমাত্র পাওনা হচ্ছে নির্ম্মম শাসন বা অত্যাচার—সেও ভিত্তিহীন অপরাধের ওজুহাতে। বুঝলুম, স্নেহের দাবী যাদের কাছে নেই, তাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে গেলে, প্রতিপালনের দামটা তারা এমনি করেই আদায় করে থাকে। সুতরাং ওঁদের সম্পর্ক না রাখাই শ্রেয়।

কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিলে গয়লা-পাড়ার একটি বুড়ী। একটি মাত্র গাইগরু সম্বল করে সে একখানা মাটির ঘরে বাস করে। ধানও ভানে, কাট্‌নাও কাটে। তাইতেই একরকম স্বচ্ছন্দে তার চলে যায়। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক রকম টলতে টলতেই চল্লাম যেদিকে দু'চোখ যায়। চারপাশে জ্ঞাতিদের বাড়ী। ভয় হলো যদি তারা বাবার পক্ষ হয়ে আমাকে আবার ধরে ফেলে! তাই এর আনাচ, ওর কানাচ দিয়ে বাগান-পুকুরের ধার ধ'রে লুকিয়ে চলতে লাগলাম।

গ্রামের এক কিনারায় গয়লা-পাড়া। তার পরেই মাঠ। ভাবলুম, গয়লা-পাড়ার ভিতর দিয়ে সোজা মাঠে গিয়ে পড়বো। তারপর মাঠ ভেঙে যাবো এমন কোন দেশে, যেখানে বাবা, মা, কি আত্মীয়-স্বজন কেউ আমার সন্ধান করতে না পারে।

কিন্তু সঙ্কল্প দৃঢ় হ'লেও, দেহ সেই অনুযায়ী সবল ছিল না। আগের দিন থেকে পেটে কিছুই পড়েনি। তার উপরে মারধোর, অত্যাচার সইতে হয়েছে চূড়ান্ত রকম। কাজেই আমার শরীর যেন আর বইতে চাইলে না। একদিকে ক্ষিদেয় যতটা কাতর না হই, জল-তেষ্টায় বুকের ভিতরটা যেন তার চেয়েও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগলো। শেষে গয়লা-পাড়ার শেষের দিকে একটা জঙ্গল-ঘেরা পুকুর দেখে তার ভিতরে নেমে পড়লাম জল খেতে।

আঁজলা করে জল খেয়ে ক্ষিদে-তেষ্টা কমলো বটে, কিন্তু শরীর যেন আরও এলিয়ে পড়লো। শেষে সেই পুকুরটার ধারে একটা আমগাছের ছায়ায় বসে পড়লাম একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে।

বসে বসে অবশেষে শুয়ে পড়লাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা বলতে পারি না।

সন্ধ্যার ঠিক আগে কার যেন ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, আমার পরিচিত গয়লানী ইচ্ছের মা আমার গা ঠেলছে আর বলছে—

"ও বাবাঠাকুর! একি! এই জঙ্গলের ধারে, মাটিতে পড়ে ঘুমোচ্ছো? এখানে যে ভারী সাপ। ওঠো ওঠো। ভদ্দর নোকের ছেলের এ কি দুর্ভাগ্যি বাপু!"

এক রকম হাত ধরেই সে আমাকে বসালে। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার সর্ব্বাঙ্গের মারের দাগগুলো লক্ষ্য ক'রে রীতিমত সমবেদনা-মাখা স্বরে বল্লে :

"আহা! তোমাকে বুঝি খুব করে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! তাই বলি—নইলে ভদ্দর লোকের ছেলে এখানে এসেই বা ঘুমুবে কেন? আহা! যার মা নেই, জগতে তার কেউ নেই। নইলে দুধের ছেলে—তাকে এম্নি করে মারে গো?"

দেখলাম, বুড়ীর মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে তার চোখ থেকে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোথাকার কে গয়লানী—আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই, আমার সত্যিকারের মারও সে দেখেনি, গায়ের দাগ থেকে অনুমান করেই আমার কষ্টে সে ব্যথিত হয়ে উঠেছে। এ কি অসম্ভব ব্যাপার!

কই, আমার বাবা বা মা তো কোনদিনই আমার জন্যে ব্যথা বোধ করেননি! মার খেয়ে হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছে, দু'-একবার

রক্তও বেরিয়েছে দাঁত-মুখ থেকে। তবু সমবেদনার "আহা" তো দূরের কথা, তার উপরে অনাহারের ব্যবস্থা দিতেও তাঁরা ইতস্ততঃ করেননি।

আর আজ একজন সম্পূর্ণ অনাত্মীয় সে, আমার দুঃখ কল্পনা ক'রে সহানুভূতিতে গলে গেল! তার চোখ দিয়ে বেরুলো কান্নার জল! এ কি অসম্ভব ব্যাপার? এমন অদ্ভুত আচরণ আমার জ্ঞানে তো কাউকে করতে দেখিনি।

আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলাম! মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি তার বশীভূত হয়ে পড়লাম।

সে আমার হাত ধরে আদর করে টানতে টানতে আবার বল্লে—"এসো বাবাঠাকুর! আমার কুঁড়েতে এসো। আহা! সারা শরীরটা দাগড়া-দাগড়া হয়ে উঠেছে! এমন কেউ নেই যে, একটু তেল লাগিয়ে দেয়? এসো বাবা! আমি তোমার গায়ের ব্যথা কমিয়ে দেব। আহা! বোধ হয় তারা খেতেও দেয়নি তোমাকে? নইলে মুখখানা এমন শুকিয়ে যায়?"

আমি কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে একান্ত বশীভূতের মত তার পিছনে পিছনে চলে তার মাটির ঘরটিতে এসে উঠলাম।

বুড়ী আমার কত সেবাই করলে! আমার সারা গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে দিতে অন্ততঃ একশো বার "আহা, উহু" করে তার সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগলো। শেষে আমাকে তার বিছানায় শুইয়ে রেখে সে গাই দু'য়ে একবাটি দুধ গরম করে আনলে। বুড়ীর পীড়াপীড়িতে প'ড়ে একরাশ মুড়ি, কলা আর সেই দুধ দিয়ে পেট ভরে আমি ফলার করলাম।

তখন রাত হয়ে গেছে। বুড়ী আমাকে কোথাও যেতে দিলে না। আমারও বাধো-বাধো ঠেক্‌তে লাগলো তার কথা ঠেলতে। যে কখনো স্নেহ-যত্নের মুখ দেখতে পায়নি, সেই আমি তার সেই অযাচিত অথচ অকৃত্রিম মায়া-মমতার আস্বাদ লাভ করে, আমার জীবনে এই প্রথম যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেলাম! হ'লোই না সে গয়লানী, তবু মনে হ'তে লাগলো, সে বুঝি আমার জন্মজন্মান্তরের অতি আপনার লোক!

রাতে বুড়ী আমাকে তার বিছানাটি ছেড়ে দিয়ে, তারই পাশে একটা চাটাই পেতে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে কত কথাই সে বলতে লাগলো! আমার মায়ের অসামান্য রূপ আর তাঁর গুণের কথা, বুড়ীর প্রতি তাঁর কত বারের কত রকম সদ্ব্যবহার! রীতিমত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে হয়েও দীন-দুঃখী, ইতর জাতের লোকদের উপর তাঁর অসীম দয়া, মায়া, মমতার বৃত্তান্ত, তাঁর দেব-দ্বিজ আর অতিথির প্রতি ভক্তি প্রভৃতি নানা গত কথা বলতে বলতে তার গলার স্বর ক্রমেই ভারী হয়ে আসতে লাগলো! সেই অন্ধকারেই বুঝতে পারলাম যে, বুড়ী মাঝে মাঝে সত্যি সত্যিই কাঁদ্‌ছে!

আমার বুক চিরদিনই শক্ত আর মনটাও হয়ে উঠেছিল রীতিমত কঠিন; তবু সেই সব অজানা পুরোণো কথা শুনতে শুনতে কি এক অজানা ব্যথায় আমার বুক যেন টন্‌ টন্‌ করে উঠতে লাগলো। আমার মন যেন কোন্‌ এক অজানা রাজ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলো এক চির-অজানা অচেনা দেবীমূর্ত্তিকে, যাঁর স্বরূপ কখনো চক্ষে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। কিংবা যাঁর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এতদিন কল্পনাতেও আনতে পারিনি—আজ এই বুড়ীর মুখে তাঁর দেবীত্বের

মহিমা বর্ণনা শুনে আমার চির-বুভুক্ষিত প্রাণ যেন কেবলই হাহাকার করে উঠ্ছিল তাঁকে হারাবার বেদনায়।

মাথার বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে শুয়ে আমি বুড়ীর কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম।

ছয়

অনেক রাত পর্য্যন্ত আমাদের কথা চল্‌লো। বুড়ীকে আপনার লোক ভেবেই অকপটে তার কাছে আমার ব্যথার কথা সব বল্‌লাম। বুড়ী কত 'আহা', 'উহু' করলে, কতবার কাঁদলে। শেষে বল্‌লে :

"চলে এসে বেশ করেছ বাবাঠাকুর! তুমি আর ওঁদের কাছে যেও না। ডাইনী সৎমা এবার হাতে পেলে নিশ্চয় তোমাকে মেরে ফেলবে। তার চেয়ে যেখানেই যাও, দুটো ভাত কি আর তোমার মিলবে না? বলে, 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।' তবু তো যখন তখন মারের হাত থেকে বাঁচবে! আহা! কচি ছেলে..."

ঘুমোতে রাত প্রায় একটা বাজলো। তারপর সকাল হতেই দেখলাম জ্বর হয়েছে। ভয়ানক জ্বর। আর কি অসহ্য যন্ত্রণা! সারা শরীরে যেন বিষফোঁড়া উঠেছে! যন্ত্রণার ঘোরে আবোল-তাবোল বকতে সুরু করলাম।

বুড়ী ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু তবু সে বুদ্ধি হারায়নি, তাই রক্ষে। আমার কথা সে পাড়ার কাউকেই জানতে দিলে না—পাছে আমার বাবা ও মা খবর পেয়ে আমাকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যান। এই কঠিন অসুখের উপর তাঁরা আরও অত্যাচার করলে আমি কি আর বাঁচবো ?

বুড়ী আমার সেবা করতে লাগলো। সে কি সেবা! আর কি মিষ্টি সান্ত্বনার কথা! আমার মনে হ'লো, এতদিন পরে বুঝি আমার স্বর্গগতা মা বুড়ীর রূপ ধরে তাঁর ছেলের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে এসেছেন! কৃতজ্ঞতায় আমার দু'চোখ বেয়ে ঝর্ঝর্ ক'রে জল ঝরতে লাগ্ল। ওষুধ-পত্র বিশেষ কিছু না পেলেও তার সেবাতেই সেরে উঠলাম এক সপ্তাহের মধ্যে।

কিন্তু দুর্ব্বল হয়ে গেলাম খুবই। তাই আরো কিছুদিন বুড়ীর ঘরেই গোপনে বাস করতে 'লো। শেষে একদিন বুড়ীই বললে:

"বাবাঠাকুর! আমার একটা কথা শুনবে? আমি কিন্তু তোমাকে না জানিয়েই তোমার একটা ব্যবস্থা করেছি। বামুন-পাড়ার রামতারণ বাবু—তোমাদেরই তো তিনি দশরাতের জ্ঞাতি। বামুন বড় ভাল লোক। তাঁদের বাড়ী আমার যাওয়া-আসা আছে কিনা—তাই কথায় কথায় তোমার কথা আমি তাঁকে সব বলেছি। তাই শুনে তিনি কত দুঃখ করতে লাগলেন। বললেন—"আহা! ছেলেটার কি দুর্ভাগ্য! নইলে এমন বেরাত নিয়ে জন্মায়? জ্ঞাতি হ'লেও, ওর বাপ আমাদের 'পরম শত্রু'। তাই তো ওদের কোন কথায় আমরা থাকি না। নইলে আমাদের বংশে জন্মে, ছেলেটা কি এমন সৎমায়ের দায়ে ভেসে যেতে পারতো?"

আমিও তোমার হ'য়ে অনেক কথা তাঁকে বুঝিয়েছি। তখন তিনি আর তাঁর পরিবারে, দু'জনে পরামর্শ ক'রে, আমাকে কি বল্লেন, জানো? বল্লেন, "ইচ্ছের মা! তুই ছেলেটাকে আমাদের কাছে নিয়ে আয়। আমরা তাকে দেখবো শুনবো, প্রতিপালন ক'রবো। আহা! হাজার হোক্ আমাদের বংশের ছেলেই তো? তবে সে কিন্তু কিছুতেই তার বাপের কাছে যেতে পারবে না। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখাও আর চলবে না। শুধু এই সর্ত্তে আমরা তার সমস্ত ভার নিতে প্রস্তুত আছি।"

তা বাছা, এমন সুযোগ ছাড়তে নেই। হলোই বা তারা পর—তবু জ্ঞাতি তো? আর তাদের অবস্থাও ভাল। ডাইনী সৎমায়ের গলগ্রহ হওয়ায় চেয়ে তাদের কাছে থাকা কি মন্দ? অবিশ্যি তোমার বাবা হাঙ্গামা বাধাতে পারেন—আর বাধাবেনও নিশ্চয়। কিন্তু তুমি না গেলে তোমাকে নিয়ে যায় কে? তাঁর স্পষ্টই বলেছেন যে, তোমার বাপের সঙ্গে বোঝাপড়া যা করতে হয়, তাঁরাই করবেন! তুমি যদি স্বেচ্ছায় না যাও, তাঁর সাধ্যও হবে না তোমাকে নিয়ে যেতে।

তাই বলছিলাম কি বাবাঠাকুর, তুমি ওইখানেই চলো। দুধের ছেলে, যাবেই বা আর কোথায়? শেষে কি না খেতে পেয়ে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে? অনেক ভেবে-চিন্তে তবে আমি এতে রাজী হয়েছি। যাবে তুমি? বলতো আজই তোমাকে সেখানে রেখে আসি।"

বুড়ীর কথায় প্রথমটায় রাজী হইনি। আবার সেই গাঁয়েই থাকা? বাপ-মায়ের চোখের উপরে? একটা সঙ্কোচের ভাবও

এসে পড়লো। ভাব্‌লুম—কাজটা কি ভাল হ'বে। হাজার হোক্‌, বাপতো! একটু কড়া-মেজাজের লোক হ'লেও তিনি দয়ামায়াহীন পশু নন, সে-কথা আমি জোর ক'রেই বল্‌তে পারি।

কিন্তু নিজের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পরে বিমাতার অভিযোগগুলি তাঁকে এমন উগ্র ও বিষাক্ত করে তোলে যে, তখন আর তাঁর ন্যায়-অন্যায় বিচারের শক্তি থাকে না। সেজন্য যতটুকু মাথা খাটানো দরকার, তেমন পরিশ্রম করবার তাঁর শক্তি বা অবসরই বা কোথায়? কাজেই তার বিষময় ফল ভোগ করতে হয় আমাকেই।

এমন অবস্থায় এই গ্রামেই যদি থাকি, তবে বাবার কাছে না থেকে অন্যের কাছে থাকা—সেটা কতটা সঙ্গত হ'বে?

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, আমার আবার 'সঙ্গত' 'অসঙ্গত' কি আছে? বাবার কাছে যাওয়ার মানেই হচ্ছে আবার সেই সংমার খপ্পরে পড়া। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আধিপত্যে ও অভিযোগে বাবার হাতে আমার লাঞ্ছনার আবার এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হবে।

কাজেই স্থির করলুম—না, সে হ'তেই পাবে না, বাড়ীতে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় তেঁতো মন নিয়ে রাগ ক'য়ে বেরিয়েছিলুম যখন, তখন অগ্রপশ্চাৎ ভাবিনি। এখনও আর ভাব্‌বার অবসর নেই।

বাড়ী থেকে বেরিয়েই কি বিপদ আমার কেটে গিয়েছিল; ভাগ্যক্রমে এমন মায়ের মত বুড়ীকে পেয়েছিলাম তাই,—নইলে হয়তো বেঘোরে মারা পড়তুম।

এই হিতাকাঙ্ক্ষিণী বুড়ী শুধু যে আশ্রয় দিয়ে, সেবা-যত্ন করে আমায় বাঁচিয়েছে, তা নয়—সে আবার আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত চিন্তাই করছে! ভয়ের কারণ কিছু থাকলে, সে কখনো আমাকে পরের বাড়ী থাকতে বলতো না। নিশ্চয়ই সে তাদের সম্বন্ধে ভালরকমই জানে। নইলে কি সে আমাকে না জানিয়েই আমার জন্যে এ ব্যবস্থা করেছে ?

শেষে বুড়ীর ব্যবস্থাই মেনে নিতে হ'লো।

সেই দিন রাতে বুড়ীর সঙ্গে জ্ঞাতির বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লাম। তাঁরাও বেশ খুশিমনে, সমাদরের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন। বুড়ী মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখে যাবে বলে আশ্বাস দিয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু আমার সঙ্গে তাকে আর দেখা করতে হ'লো না। চির-হতভাগ্যকে স্নেহ করবার অপরাধে কলির ভগবান্ বুঝি তাকে চরম-দণ্ড না দিয়ে আর থাকতে পারলেন না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিসূচিকা রোগে আমার মাতৃতুল্যা হতভাগিনী তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেল!

এই নিদারুণ সংবাদ শোনা অবধি বুড়ীর জন্যে আমার মনটা হাহাকার করতে লাগলো। জীবনে প্রথম স্নেহের সন্ধান ওই বুড়ীর কাছেই পেয়েছিলাম, সে-কথা আমি আজ কিছুতেই ভুলতে পারলুম না। নিজের মাও বুঝি তার সন্তানের জন্য এতটা করে না। বুড়ীর শোকটা তাই মাতৃশোকের মত আমার বুকের উপরে চেপে বসলো।

সাত

দিন কাটতে লাগলো। নতুন আশ্রয়ে এসে প্রথম দু'চার দিন যত্ন পেলাম বেশ, কিন্তু তারপর থেকে ক্রমেই তা কমতে লাগলো। ঘরের ছেলে আর পরের ছেলের যত্নের মধ্যে পার্থক্য কতখানি হওয়া উচিত, তা বুঝতে মোটেই দেরী হলো না। তবু দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তো পাচ্ছি, কাজেই তার জন্যে ক্ষোভ করবার আর আছে কি ?

ক্রমে দু'একটা করে ছোট ছোট কাজের ভার আমার ঘাড়ে চাপতে লাগলো—অবশ্য তা মিষ্টি কথার উপর দিয়েই। আমিও বিনা আপত্তিতে, খুশিমনে তা করে যেতে লাগ্‌লাম।

তামাক সাজা, দোকান-বাজার করা, ছোট ছেলে-মেয়েদের সামলানো থেকে, সুরু হয়ে ক্রমে চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই জলতোলা, বাসন-মাজা পর্য্যন্ত ঘাড়ে এসে পড়লো। চাকর, দাসীর অভাব, কর্ত্রীর অসুস্থতা ইত্যাদির অজুহাত—থাকতে গেলে এমন একটু-আধটু সাহায্য করতেই হয়। ঘরের কাজ,—এতো আর পরের কাজ করা নয় ? কাজেই আপত্তি করবার মুখ আর থাকে কই ?

আমার জ্ঞাতি প্রতিবেশীদের চোখ কিন্তু বেজায় টাটিয়ে উঠ্‌লো। তাঁরা আড়ালে-আব্‌ডালে আমাকে অনেক রকম বোঝাতে সুরু করলেন। কেউ কেউ নিন্দা, ভর্ৎসনা করতেও কসুর করলেন না।

ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে, এই বয়সে বাপ-মার সম্পর্ক কাটিয়ে পরের বাড়ী বিনা পয়সায় চাকরবৃত্ত করা অতি জঘন্য কাজ, এতে বাপের মাথা হেট করা হয়, বংশের নাম ডুবে যায়। বাপ বেঁচে থাকতে বাপের জ্ঞাতির চাকর হ'য়ে থাকা! ছিঃ! ছিঃ! আমি যেন আর একটি দিনও এখানে না থাকি। বাপের কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাঁর কাছে গিয়েই যেন উঠি।

কেউ বললে—"ধিক্! ধিক্! তুমি বাপু এমন কুলাঙ্গারও হয়েছ? তোমার ভিতর কি একটু মনুষ্যত্বও নেই? বাপ মা থাকতে তার শত্রুর বাড়ীতে বাসন মেজে, জল তুলে বেড়াও? গলায় দড়ি দিতে পার না? এমন বয়াটে, বদমায়েস, লক্ষ্মীছাড়া হ'যে বেঁচে থাকার চেয়ে তোমার পক্ষে মরণই ভাল।"

সকলের কথাই শুনে যাই, কিন্তু উত্তর করি না। বুঝি যে, তাঁদের অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা নয়। তাঁরা যা বলেন, তা ঠিকই। কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি সমবেদনার খাতিরে কিছুই বলেন না। তাঁরা বলেন হিংসায়। তাঁরা থাকতে রামতারণবাবুই যে এমন একটা বিনা মাইনের চাকর পেয়ে যাবেন, সেটা তাঁদের অসহ্য। নইলে, যে হতভাগাকে তার শৈশব থেকেই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে দেখেও তাঁদের একটি দিনের জন্যেও বিন্দুমাত্র সমবেদনা জাগেনি, আজ হঠাৎ তার উপরেই বা এত দরদ কেন?

নিজের হীন দশা বুঝেও তাই চুপ করেই থাকি। ভাবি, রামতারণবাবুরই বা দোষ কি? দোষ আমার ভাগ্যের। এরা যে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিচ্ছে, এই যথেষ্ট। এতে মান-অপমান

ভেবেই বা কর্‌বো কি ? মারধোর ও লাঞ্ছনার হাত থেকে যে রেহাই পেয়েছি, এই যথেষ্ট।

এমনিভাবে আরো তিন মাস কাটলো। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম এক অপূর্ব্ব কথা! রামতারণবাবু আর তাঁর স্ত্রী গোপনে তা আমাকে শুনালেন। আমিও খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

শুনলাম, আমার গর্ভধারিণী ছিলেন এক অবস্থাপন্ন লোকের একমাত্র মেয়ে। তাঁদের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন আমার মা। কিন্তু তাঁর ছিল জীবন-স্বত্ব অর্থাৎ যতদিন নিজে বেঁচে থাক্‌বেন, ভোগ কর্‌তে পারবেন, বেচ্‌বার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু তাঁর যদি কোন সন্তান হয়, তবে সে-ই হবে তার মাতামহের সমস্ত সম্পত্তির আসল মালিক।

মা কিন্তু সে সম্পত্তি ভোগ করতে পারেননি। কারণ, তার অল্পদিন পরেই আমার জন্ম হয়, আর তিনি আঁতুড় ঘরেই দেহত্যাগ করেন। সেই দিন থেকে আমিই আমার দাদামশায়ের সব সম্পত্তির মালিক হয়ে আছি।

এতবড় একটা সম্পত্তির মালিক আমি—এই হিংসায় আমার সৎমার মনটা আরও বেশী বিষিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্পত্তি তো আমার দ্বারা তাঁর নিজ নামে লিখিয়ে নিতে পারেন না! অথচ আমি সাবালক হ'তে তখনও ঢের দেরী, কাজেই তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ প্রায় পেরিয়ে গিয়েছিল—তারই ফলে বাবার কাছে তিনি আমার নামে অত বেশী অভিযোগ করতেন।

রামতারণবাবু বল্লেন,—কোনো রকমে আমি সাবালক হ'লেই আমার সৎমা আমাকে দিয়ে ওই সব সম্পত্তি তাঁর নিজের নামে লিখিয়ে নিতেন—তারপর দিতেন আমাকে দূর করে। এই মতলবেই হেলায়, অশ্রদ্ধায় আমাকে মানুষ করা হচ্ছিল।

রামতারণবাবু সবই জানেন। বরাবরই তিনি নাকি দুঃখু করে এসেছেন আমার জন্যে। কিন্তু কি করবেন? তাঁর কোন হাত ছিল না। তারপর ইচ্ছের মার মুখে আমার দুর্দ্দশার কথা শুনেই তিনি স্থির করেছিলেন, আমি যদি রাজী হই, তাহলে তাঁর যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করবেন। বাপ-মার কবল থেকে আমাকে ছিনিয়ে আনতে পারলেই, আমার বিমাতার মন্দ অভিপ্রায়ে বাধা দিতে পারবেন।

আমাকে তাঁদের ঘরে স্থান দেওয়ার কারণই তাই। তারপর নিজের অর্থ ব্যয় করে আমার বাবাকে ফৌজদারীর হাত থেকে যে বাঁচিয়েছেন, তাও সেই উদ্দেশ্যে। নইলে কি সহজে তিনি আমার অভিভাবকের দাবী ছেড়ে দিয়ে রামতারণবাবুকেই আমার অভিভাবক বলে স্বীকার করতেন?

রামতারণবাবু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ করে বুঝিয়ে বল্লেন, "তা যাক্, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করেছেন। সেই বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেওয়ার উপায় এখন আর তাঁদের নেই! কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা আর এক কু-মতলবে মেতেছেন। জমিদারকে দিয়ে নীলাম করিয়ে তাঁরা বিষয়টি কিনে নিতে চান। তুমি তা জানবেও না—জানলেও কিছু করতে পারবে না। কারণ, তুমি আজও নাবালক; তায় আবার কপর্দ্দকহীন।"

রামতারণবাবু এই পর্য্যন্ত বলে একটু নীরব হলেন, তারপর দু'একবার ঢোক গিলে ও একটু কেসে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তাঁর কাছে আশ্রয় পাবার জন্য আমার কতটা কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আমি তা স্বীকার করলাম।

আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে রামতারণবাবুর বুকে বুঝি কিছু বল হল, তিনি তখন সাহস করে বললেন, "সে তুমি চিরদিনই স্বীকার করবে, আমি তা জানি। কারণ, লোকে যে যাই বলুক্, তুমি অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম নও, সেকথা আমি বেশ জোর গলায় বলতে পারি।

এখন কথাটা কি হচ্ছে জান? জমিদারের মারফৎ যদি বিষয়টা ঐ ভাবে নীলাম হয়ে যায়, তবে তুমি চিরদিনের জন্য ফকির হয়ে যাবে। কাজেই আমি এক মতলব ঠিক করেছি, শোনো। তুমি নাবালক হলেও, অবোধ নও। তুমি নিশ্চয় আমার উপদেশ অবহেলা করে নিজের পায়েই কুড়ুলের ঘা দেবে না। আমার পরামর্শ যদি শোনো, তবে তোমার বিষয় নেয় কে? দুদিন বাদে তোমার এমন পরের গলগ্রহ-দশা ঘুচে যাবে। তখন তুমি হবে একটা রীতিমত অবস্থাপন্ন লোক আর তুমিই তখন কতজনকে সাহায্য করতে পারবে!

তোমার এখন উচিত হচ্ছে কি জান? তোমার এই সম্পত্তি অন্য কারো নামে বেনামী করা।

সম্প্রতি আমিই তোমার অভিভাবক—দেশশুদ্ধ লোক সেই সাক্ষ্য দেবে। কাজেই তুমি যে বেনামী বিক্রি-দলিল করবে,

অভিভাবক হ'য়ে আম· তা'তে সই দিতে রাজী আছি। তাহলে তোমার সৎমার পরামর্শেও তোমার বাবা আর কিছুমাত্র নড়্ চড়্ করতে পারবেন না।

আইনে যদি কিছু আটকায় সে আমি দেখে নেবো। এমন একটা দলিল পণ্ড করতে হ'লে যে বুদ্ধি ও অর্থের দরকার, তোমার বাবার সে সব কিছুই নেই। কাজেই তোমাব দলিল সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমি যা'তে আছি, তা নড়্ চড়্ কবা তোমার বাবা বা তোমার সৎমাব কাজ নয়।"

একটু দম নিয়ে রামতারণবাবু আবাব বলতে লাগলেন, "দেখো, আমাব এক শ্যালক আছে; তার নাম রজনীকান্ত।

বজনী খুব ভাল ছেলে। এই বাড়ীতেই সে মানুষ হয়েছে। আমার আর আমার স্ত্রীর কথায় সে ওঠে বসে। সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। অতএব বিক্রয় কবালাটা তুমি তারই নামে করে দাও। বিষয়টা নিরাপদ হবে।

মনে রেখো. কাজটা কিন্তু খুবই জরুরী। এতে দেরী করা মোটেই চলে না। তোমার সৎমার পরামর্শে তোমার বাবাও নিজে যে রকম চেষ্টা জুড়েছেন, তা'তে নীলাম হয়তো এই মাসেই হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাকে রেজেষ্ট্রী ক'রে দিতে হবে দু একদিনের মধ্যেই।"

বহুক্ষণ ধরে সব কথা শুনে গেলাম। কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না। সে জন্যে ভাবনাও হ'লো না এতটুকু। বিষয়

শেষে চোরাই মাল বেরুলো আমারই বিছানার তলা থেকে।

লাভের কথা কিছুই জানতাম না, সে আশাও কখনো করিনি। তেরো বছরের ছেলে—বিষয়ের বুঝিই বা কি ?

এইটুকু শুধু বুঝলাম, রামতারণবাবু এখন আমার বাবা ও মায়ের দোষ দেখিয়ে সম্পত্তিটা বেনামী করে নিতে চান।

তাঁর উপর একটু ঘৃণা হ'ল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, জমিদারের চক্রান্তে সম্পত্তি যদি নীলামই হ'য়ে যায়, তবে তো কারোই কোনো ভোগে লাগবে না। সৎমা যদি কৌশল করে কিনিয়ে নিতে পারেন, তা হ'লেও কারো কোনো কাজে আসবে না—আমার বাবারও নয়। কারণ, সৎমা তখন অহঙ্কারে বাবাকেও তুচ্ছ কর্‌বেন, তার উপর নানা অত্যাচার কর্‌বেন।

তার চেয়ে রামতারণবাবুর পরামর্শ মত যদি দলিলটা করে দিই, তা হ'লে সম্পত্তিটা কালে হয়তো রামতারণবাবুর ছোট ছেলে 'চাঁতুব' হাতেও কিছু এসে যাবে।

যে সম্পত্তির আমি কিছুমাত্র আশা করিনি, তা দিয়ে যদি 'চাঁতুর' কোনো উপকার হয়, তা হ'লে ক্ষতি কি ? বেনামী সম্পত্তি আমাকে যদি ফিরিয়ে দেয়, আমিও তা হ'লে চাঁতুকেই কতকটা দিব,—তাকে যে আমি বড্ড ভালবাসি! আর আমাকে যদি ফিরিয়ে না দেয়, তা হ'লেও চাঁতুর হাতে যাবার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশী। চাঁতু পেলে আমার তো দুঃখের কারণ কিছুই নেই। কাজেই, আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলাম।

আমার এই সুবুদ্ধি দেখে তাঁরা আমাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। আমার মত বুদ্ধিমান আর আমার মত সৎছেলে তাঁরা যে ইতিপূর্ব্বে দেখেননি, সে কথা তাঁরা বারংবার আমাকে জানিয়ে

দিলেন। বহুকাল পরে সেই দিন থেকে আবার সেই প্রথম কয়দিনের মত আদর-যত্ন পেতে লাগলাম।

কিন্তু কে জানত যে সেই আদর যত্ন আমার ভাগ্যে অচিরে আবার আবুহোসেনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে! বিক্রয়-কবালা রেজেস্ট্রী হয়ে যাবার পরদিন থেকেই হু-হু করে আদর কমতে কমতে সেই বিনা মাইনের চাকরে এসে দাঁড়ালাম এক সপ্তাহের মধ্যেই। তারপর প্রায় প্রতিদিনই আমার একটা ক্রটী বেরুতে লাগলো। সামান্য অনুযোগ থেকে ক্রমেই ভীষণ ভর্ৎসনা আর গালাগালি আমার যেন নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠলো। বুঝলাম যে অশান্তির জ্বালায় বাপ-মার ঘর ছেড়ে অনির্দ্দিষ্টের পানে ছুটে বেরিয়েছিলাম, এখানেও সেই অশান্তি ক্রমেই যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

বিক্রি-কবালার কথা জানতে কারো বাকী রইলো না। জ্ঞাতিরা সব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁদের যেন আহার-নিদ্রা ত্যাগ হওয়ার উপক্রম হয়ে এল। রামতারণবাবুর বিরুদ্ধে তাঁরা দিনরাত জল্পনা-কল্পনা সুরু করে দিলেন। আমার আর বাইরে বেরুবার উপায়ই রইলো না।

পথে ঘাটে যেখানে-সেখানে আমার দেখা পেলেই তাঁরা নানা নিন্দা, ভর্ৎসনা, গালাগালি এমন কি নানা রকম ভয় দেখানো সুরু করে দিলেন। সম্পত্তির মালিক আমি হলেও, রামতারণবাবুর মতলব মত কাজ করে আমি যেন তাঁদেরই মহা সর্ব্বনাশ করে বসেছি।

রামতারণবাবুর আশ্রয়ে বাস করাও ক্রমে দুর্ঘট হয়ে উঠলো। কাজের ভার যত বাড়ে, ক্রটীর অভিযোগও হতে থাকে তত বেশী।

ফলে বাপের বাড়ীর মত তাড়না, ভৎর্সনা, প্রহার, অনাহার সব কিছুরই পুনরাভিনয় হতে লাগলো কথায় কথায়। পাড়া প্রতিবেশী আর জ্ঞাতিদের তাতে যেন স্ফুর্ত্তি বেড়ে গেল! তাঁরা সব "বেশ হয়েছে! ঠিক সাজাই হচ্ছে। যেমন কাজ তার তেমান ফল। অমন সর্ব্বনেশে ছেলের এই দশা হবে না তো হবে কার? মর ব্যাটা! আমাদের কথা না শোনবার ফলটা ছাখ্।"…ইত্যাদি নানা মধুর কথা যখন তখন আমাকে শোনাতে লাগলেন। চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে আমি একেবারে নির্ব্বাক হয়ে যেতে লাগ্‌লাম।

তারপরেই এক মহা বিপদ্। রামতারণবাবুর বড় মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এল বেড়াতে। তার গায়ে ভারী ভারী সব গহনা। পরদিনই তার গলার হার আর কানের দুলজোড়া চুরি হয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ খোঁজ—মহা হুলুস্থুল ব্যাপার! পাড়া-প্রতিবেশী আর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা কানাকানি করতে লাগলো। শেষে সেই চোরাই মাল বেরুলো আমারই বিছানার তলা থেকে!

কত দিব্য, শপথ, কান্না! সবই হ'লো অকারণ। বরং তাইতেই আবো প্রমাণ হ'লো যে আমি একটা পাকা চোর। তখন সুরু হ'লো প্রহার।

আমাকে পুলিশের হাতে দেবার জন্যে সবাই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু রামতারণবাবুর নাকি বড্ড মায়া পড়েছিল আমার উপরে, তাই জেলের বদলে তিনি আমাকে ঠেলে ফেলে দিলেন অনির্দ্দিষ্টের পথে, মাত্র ঘা কয়েক বেত আর গলাধাকা দিতে দিতে।

লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে ও প্রহারের ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের পথ ধ'রে চল্‌তে লাগ্‌লাম—যে দিকে দু চোখ যায়। হতভাগ্যের জীবন আবার আগেকার মতই দুর্ব্বল হয়ে উঠ্‌ল।

আট

পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাফ নেই। তবু কিন্তু আমার মিথ্যা অপরাধের কথাটা নিমেষের মধ্যে পাড়াময় ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘরে ঘরে মেয়ে-পুরুষ সকলেই আমার উদ্দেশে ধিক্কার দিতে সুরু করেছিল। আমার মত বয়াটে বদমাইস চোর ছেলেকে গ্রামে বাস করতে দেওয়া নিরাপদ নয়, এমন কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করতেও অনেকে পশ্চাৎপদ হ'ল না।

কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের পথ দিয়ে যাবার কালে তাঁরা আমার প্রতি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন, যা কেউ পাগলা কুকুরকে দেখে করে কিনা সন্দেহ। সে ধিক্কার, সে নিন্দা, সে গালাগালি, সে দূর-দূর ধ্বনি আজও আমার বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। পাড়ার ছেলেরাও তাঁদের শিক্ষামত "চোর! চোর! সবাই সাবধান হও। চোর যাচ্ছে।"...বলে আমার পিছনে দল বেঁধে চীৎকার সুরু করলে। কেউ বা কাদা ছুঁড়ে মারতে লাগলো, কেউ মাথায় চাঁটি বসিয়ে দিলে। কি কষ্টে যে সে গ্রাম পার হ'য়ে মাঠে এসে পড়লাম, তা আর বলে বোঝাতে পারি না।

তেজশঙ্কর এইবার চুপ করলে। তার অতীত জীবনের করুণ কাহিনী বলতে বলতে তার মত কঠিন-হৃদয় লোকেরও স্বরটা

ক্রমেই ভারী হয়ে আসছিল। বুঝলাম, বাল্যজীবনের সে-ব্যথা আজও সে ভুলতে পারেনি। সে স্মৃতি তাঁর জীবনের এই শেষ মুহূর্তেও তার কাছে কষ্টকর। তাই সে নিজেকে সেই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে দৃঢ় করে নেবার উদ্দেশ্যে একটু নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আমারও মনের উপরে এতক্ষণ যেন একটা ছায়াচিত্রের একটানা অভিনয় হয়ে যাচ্ছিল। তার দৃশ্যের পর দৃশ্যে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠ্ছিল একটা হতভাগ্য মাতৃহীন বালকের জীবন-নাট্যের করুণ-কাহিনী। তার মর্ম্মন্তুদ ঘটনাবলীর মধ্যে আমি এমন ভাবে আমাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিল না যে আমি গল্প শুনছি। যা শুনছি, তা যেন আমি স্বচক্ষেই দেখছি—সে সব ঘটনা ঘটেছে যেন ঠিক আমার চর্ম্মচক্ষেরই সম্মুখে।

তেজশঙ্কর থামতেই আমারও যেন চমক ভেঙে গেল! আমি যেন আবার আমাকেই আবিষ্কার করলাম সেই লোহার ডাণ্ডাঘেরা জেলের হাজত-ঘরের মধ্যে। বুঝলাম,—যে চির-হতভাগ্য শিশুর করুণ শৈশব-কাহিনী শুনতে শুনতে এতক্ষণ আমি তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলাম, সে-ই আজ ব'সে রয়েছে ঠিক আমারই সম্মুখে, মহা অপরাধী ফাঁসির আসামীর রূপ ধরে।

মনটা যেন কেমন হয়ে গেল! এক নিমেষে অনেক চিন্তাই যেন তার ভিতরে জটলা বাধিয়ে তুল্লে! আমার যেন বোধ হ'তে লাগলো যে আমাদের এই সভ্য জগৎ তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা প্রভৃতির যে দর্প করে, সেটা তাদের মস্ত ভুল। নীতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা যাদের গায়ে অপরাধীর ছাপ মেরে আসছে,

আসলে অপরাধী হয়ত তারা নয়—আর অপরাধী হ'লেও, ন্যায় বিচার অনুসারে সে জন্যে তাদের সাজা দেওয়া চলে না। সাজার যোগ্যপাত্র হ'চ্ছে তারাই, যাদের দোষে, বা যাদের জন্যে এরা আইন-বিগর্হিত অপরাধ করতে বাধ্য হয়।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম,—মানুষ মানুষের প্রাণ আর মানুষের প্রেরণা নিয়েই জন্মায়, পশু হয়ে জন্মায় না; পশু হ'তেও সে আসেনি। তাকে পশু করে তোলে একমাত্র মানব-সমাজের বিরুদ্ধ আবহাওয়া, যার বিষাক্ত স্পর্শ তাকে মানুষ হতে না দিয়ে, একটা কিম্ভূতকিমাকার মানুষবেশী পশুতেই পরিণত করে দেয়।

আমি তো 'জেলার'। কত চোর, কত খুনে, কত দস্যু, কত নানা অপরাধের অপরাধীকে নিয়েই আমার কারবার। কিন্তু তাদের সে সব অপরাধের জন্যে দায়ী কি কেবল তারাই? চোর চুরি করেছে, তাই তার হয়েছে কয়েদ। কিন্তু কেন সে চুরি করলে? খুনী অপর একজনের বুকে ছোরা বসিয়ে দিলে কি জন্যে? দস্যু কিসের প্রয়োজনে গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লুট করে নিলে? তাদের এ সব অপরাধের কি কোন হেতু নেই? অপরাধ যে করে সেই দোষী? আর যে বা যারা সেই অপরাধের হেতু বা প্রবর্ত্তক, তারা কি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ?

আমার মনে হলো যে, সভ্য সমাজের পক্ষপাতিত্বই তাদের সমাজ-গঠনের মস্ত বিরোধী। এত দণ্ডের ব্যবস্থা থাকতেও তাই অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না।

যতদিন এক শ্রেণীর লোক তাদের স্বার্থজ্ঞান, তাদের

পরিতৃপ্তিশূন্য লোভ, তাদের অবিবেচনা, তাদের হৃদয়হীনতা নিয়ে অপর দলকে সর্ব্বরকমে বঞ্চিত করতে থাকবে—যতদিন এই প্রথম দলের অযথা অত্যাচারে দ্বিতীয় দল তাদের জন্মগত, তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করবার সুযোগ-সুবিধা না পাবে, ততদিন হাজার ধর্ম্মের দোহাই, হাজার নীতিশাস্ত্রের কচকচি, হাজার আইন, হাজার শৃঙ্খলা সত্ত্বেও অপরাধ তারা করবেই। এই অপরাধই তাদের ধর্ম্মযুদ্ধ,—তাদের জেহাদ।

তেজশঙ্কর একজন মহা অপরাধী। তাই সভ্য সমাজের আইন কঠোরতম দণ্ডে তাকে দণ্ডিত করেছে। কিন্তু এত বড় অপরাধী সে হলো কেন, সে কথা ত কেউ বিচার করে দেখেনি! নিতান্ত শৈশব থেকেই স্বার্থপর মানুষের সমাজ তাকে মানুষ জাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে শিখিয়েছে। তারা তাকে বুঝিয়েছে যে. এই জগতে দয়া, মায়া, মমতা, বিচার, বিবেচনা বলতে কিছুই নেই। ছলে, বলে, কৌশলে নিজের স্বার্থ-সাধনই মানুষের শ্রেষ্ঠ নীতি।

তারা তেজশঙ্করের শিশু বক্ষের কোমল পর্দ্দার উপরে তারই রক্ত দিয়ে গভীর অক্ষরে লিখে দিয়েছে—"মানুষই মানুষের শত্রু। মানুষই মানুষের সর্ব্বকষ্টের কারণ।" তার ফলে এখন যদি সে মানব-সমাজের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সে দোষ কি তার একার?

কথাটা ভাবতেই এই সঙ্গে আরও হাজার কথা একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করে আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছিলো, কিন্তু তাতে বাধা পড়ে গেল। একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম করে নেবার পর তেজশঙ্কর তার নিজের কথা আবার বলতে সুরু করলে।

নয়

তেজশঙ্কর বলছিল :—

বেলা তখন প্রায় দুপুর। মাথার উপর বৈশাখের জ্বলন্ত সূর্য্য যেন চারিদিকে আগুনের রাশি ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাসের গায়েও ঠিক আগুনের হল্কা। সেই তপ্ত বাতাস আমার মাথার উপর দিয়ে কেবলই গোঁ গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। এক একবার পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সেই যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ এক অজানা অচেনা অনির্দ্দিষ্টের পানে।

আমি গোঁ-ভরেই চলেছি এক দিক লক্ষ্য করে—অথচ কোন কিছুতেই আমার লক্ষ্য নেই। যেতে হবে, তাই যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি বা কোথায় যাচ্ছি, তা তখন ভাবে কে ?

মাঠের মধ্যে পথ বলতে বিশেষ কিছুই নেই। পথ কি অপথ, তাই বা তখন দেখছে কে ? কখনো আ'ল, কখনো বা চষা ক্ষেত,—যখন যা সমুখে পড়ছে তারই উপর দিয়ে একটানা চলতে সুরু করেছি।

চলছি, আর ভাবছি আমার প্রতি আমার বাবা, মা, আর আত্মীয়-স্বজনদের অত্যাচারের কথা। রামতারণবাবুর দুষ্ট-বুদ্ধি ও বিশ্বাসঘাতকতা, অবশেষে বিনা দোষে চোর বদনাম দিয়ে সারা দেশের লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ করা, তারপর বিনা বিবেচনায় আমার মত নিরীহ লোককেও সারা দুনিয়ার মর্ম্মান্তিক উপহাস—এ সব কথা যতই আমি মনে মনে তোলপাড় করি, ততই

আমার মনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহও যেন বিষের জ্বালায় জ্বলে যেতে থাকে। কখনও দাঁতের উপর দাঁত চেপে ধরি, কখনো নিজের অজ্ঞাতেই যেন নিজের হাত ছুটো মুষ্টিবদ্ধ ক'রে তাদের বিরুদ্ধে উৎকট প্রতিহিংসা নেওয়ার কল্পনায় মেতে উঠি, কখনো বা কেউটে সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে নিজের নাক দিয়ে জ্বালাময় নিঃশ্বাস ফেলতে থাকি।

এব উপরে আবার গ্রামবাসীদের অবিচারের স্মৃতি--তাদের হৃদয়হীন ছুর্ব্ব্যবহারের চিন্তা। বারো-তেরো বৎসরের একটা হতভাগ্য ছেলের সম্বন্ধে সামান্য একটা কুৎসার কথা শুনেই তারা বিনা বিচারে তার উপরে এক মুহূর্ত্তে খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারলো, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে লোক-পরম্পরায় তার প্রতি তার অভিভাবক বা নিকট-আত্মীয়দের অযথা নির্য্যাতনের বহু সংবাদ পেয়েও, তাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও পরের ঝঞ্ঝাটে মাথা গলিয়ে, সেই হতভাগ্য বালকটির প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারেনি! এরাই আমার পল্লীবাসী, এরাই আমার দেশের লোক!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটা উৎকট প্রতিহিংসার সঙ্কল্পে আমার সমস্ত শরীরটা দৃঢ় হয়ে উঠ্‌ল। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম—না, না, আমি নিজের সুখ চাই না। নিজের জীবনেও আমার আর মমতা নেই। কিন্তু যারা আমাকে শৈশব থেকেই এমন ভাবে উৎপীড়ন করে এসেছে, তাদের ধ্বংস আমি দেখবোই—যেমন করে পারি, তাদের সর্ব্বনাশ-সাধন আমি করবোই।

পাগলের মত এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আপন মনে আবোল-তাবোল বকছি আর এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো মাঠ ভেঙে

হন্ হন্ করে চলছি কোন্‌দিকে, তা তখন আমার খেয়ালই ছিল না।

বৈশাখের দুপুর। বিশেষতঃ কয়েক মাস যাবৎ বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। জলের জন্যে হাহাকার করতে করতে পৃথিবীর বুক শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। সারা মাঠের জমি হয়ে উঠেছে ফুটিফাটা। আমার বুকও দারুণ তৃষ্ণায় সেই রকম ফাটবার উপক্রম করলেও, সে কষ্টের দিকে আমার তখন লক্ষ্য ছিল না। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, বিতৃষ্ণার কথা ভাবতে ভাবতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলেই গেছলাম। নইলে সেই কিশোর বয়সে, সেই প্রতিকূল অবস্থায়, ছয়-সাত ক্রোশ মাঠ ভেঙে, কোন অনিশ্চিত আশ্রয়ের অভিমুখে চলা আমার পক্ষে বোধ হয় সম্ভবপর হতো না।

ক্রমে দিনের আলো নিভে এল। পশ্চিম আকাশে লালের আভা ছড়িয়ে সূর্য্যদেব দিক্-চক্রবালের আড়ালে গা ঢাকা দিতে লাগলেন। আমার মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বক, বিল-হাঁস আর পানকৌড়ির দল তাদের বাসার দিকে উড়ে যেতে লাগলো। গাছে গাছে হাজার পাখীর কিচিমিচি।

বুঝলাম, রাতের আর দেরী নেই। এখনই একটা গ্রাম না পেলে, এই মাঠের মাঝেই আমাকে রাত কাটাতে হবে। সব চিন্তা ঘুচে গিয়ে তখন আমার মনে ভয় এসে গেল। হাজার দুঃখের জীবন হোক্, তবু মাত্র চৌদ্দ বছরের ছেলে আমি; আমার মনে এমন অসহায় অবস্থায় ভয় না হযে কি পারে?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঠিক সেই সময়ে আমার চোখে পড়লো একটা গ্রামের চিহ্ন। আমার দক্ষিণে প্রায় পোয়া মাইল দূরে

অনেকগুলো আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ আর ওই সঙ্গে দু'-একটা চালাঘরও দেখতে পেলাম। তখন কোনও রকমে "পড়ি কি মরি" করতে করতে সেই গ্রামটিতে গিয়ে ঢুকলাম।

প্রথমেই দু-চারটে বাগান, বাঁশঝাড়, ডোবা, আগাছায় ভরা পতিত জমি। তাদের পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে ঘুরপাক খেতে খেতে সরু মাটির পথটা ক্রমেই চওড়া হয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে। সেই পথ ধরে চলতে চলতে শুনতে পেলাম গ্রামের কুলবধূরা ঘরে ঘরে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বেলে শাখে ফুঁ দেবার আয়োজন করছে। বুকে একটু আশা হ'লো যে, এতগুলি ভদ্র গৃহস্থের বাস যখন এই গ্রামে রয়েছে, তখন আমার মত একটা নিরাশ্রয় ভদ্রসন্তান অন্ততঃ আজ রাতের মত একটু আশ্রয় আর দু'-মুঠো ভাত পাবে নিশ্চয়। আশায় বুক বেঁধে তাই কোন রকমে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে চল্লাম।

একটু পরেই এসে পড়লাম একটা কোঠা-বাড়ীর সমুখে। দেখলাম, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাড়ীর সুমুখে পথের পাশে দাঁড়িয়ে হুকোয় তামাক টানছেন। ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ—তাঁর গলায় পৈতে। তাতে আবার এক থোলো চাবি বাঁধা। মনে করলাম, এঁর কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা করি। যে রকম অবসন্ন হ'য়ে পড়েছি, তাতে আর এক পাও এগোনো আমার পক্ষে মহাকষ্টকর।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই তিনি কটমট করে আমার দিকে চাইতে চাইতে বলে উঠলেন :

"কে হে ছোকরা? তোমাকে বিদেশী ব'লে মনে হচ্ছে। বলি, যাবে কোথায়?"

ভাবলুম, ভদ্রলোক বোধ হয় খুব দয়ালু।, তাই তিনি আপনা হ'তেই জানতে চাইছেন যে, রাত্রিকালে এই বিদেশে যাথর্থই আমি আশ্রয়প্রার্থী কি না। তা হ'লে হয়তো তিনি আমাকেআশ্রয় দিতে প্রস্তুত।

রীতিমত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম—"আজ্ঞে, অনেক দূর থেকে আসছি। সারাদিন খাওয়াও হয়নি। রাত হয়ে আসছে দেখে এই গ্রামে এসে ঢুকেছি। যদি কোথাও আশ্রয় পাই তো সেখানেই রাতটা কাটিয়ে আবার সকালে চলা সুরু করবো।"

ভদ্রলোক মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে ঘাড় নাড়তে নাড়তে কর্কশ স্বরে বল্লেন—"ঠিক, ঠিক। যাবার সময় যার যা পাও হাতিয়ে নিয়ে স'রে পড়তেও কসুর করবে না, কেমন? তুমিও তা হলে তাদেরই দলের?"

অবাক্ হয়ে গেলাম। কাদের কথা ইনি বলছেন? আমাকেই বা তাদের দলের একজন বলে মনে করছেন কেন? বিশেষ, যার যা পাই হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়বার কথাই বা বলেন তিনি কি জন্যে?

প্রশ্নগুলি মনে মনেই তোলপাড় করে নিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে বল্লাম—"আজ্ঞে, কাদের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না তো। তবে আমার সঙ্গী কেউ নেই। আমি একাই আসছি।"

"বেশ করেছ! তুমি তা হ'লে একাই একশো। কিন্তু এ-সব চালাকি তো চলবে না ধন! ভাল চাও তো গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। নইলে দফাদার ডেকে এখনি ধরিয়ে দেব। যাও।"

বজ্রগম্ভীর স্বরে এই কথাগুলি বলে, তিনি হাত তুলে আমাকে গ্রাম থেকে বেরুবার আদেশ আর পথ দুই-ই জানিয়ে দিলেন।

আমার তখন গা টলছে। মাথাও ঘুরছে বন্‌বন্‌ করে। সারাদিন অন্ন-জলের মুখ দেখিনি—তার উপরে ছয়-সাত ক্রোশ হেঁটে এসেছি। কাজেই আর কোন উত্তর না দিয়ে আমি আবার চলতে লাগলাম।

একটু যেতেই দেখলাম একটা পাকা-বাড়ীর বারান্দা। পথের ঠিক ধারেই সেই বারান্দাটিতে সতরঞ্চ পেতে একদল যুবা খুব সোরগোলের সঙ্গে পাশা-খেলা সুরু করেছে। "কচে বারো", "ছ' তিন নয়" চীৎকারে তারা সেই স্থানটিকে বেশ সরগরম করে তুলেছে।

আমাকে সেই বাড়ীটির সুমুখ দিয়ে যেতে দেখে হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন আমার প্রতি খরদৃষ্টিতে চাইতে লাগল। শেষে বল্লে —"কে যায়? কোথায় বাড়ী হে ছোকরা?"

বল্লাম, "আজ্ঞে, আমার বাড়ী ভিন্‌ গাঁয়—এখান থেকে ছ'-সাত ক্রোশ দূরে।"

"বটে? তা এ-গাঁয় এসেছো কি জন্যে? সিঁদ দেবে? দাঁড়াও তো হে ছোকরা! দেখি তোমার চেহারাটা একবার।"

কথা বলতে বলতে সে একটা হ্যারিকেন নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল। তারপর সেই আলোয় বেশ করে আমায় দেখতে দেখতে বল্লে—"হাঁ, যা ধরেছি তাই। চোর না হলে এমন ঝড়ো চেহারা হয়? তা, যাচ্ছো কোথায়? কার বাড়ী আজ অতিথ হবে ভাবছো?"

দেখলাম ব্যাপার সুবিধের নয়। এরও ঠিক সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটির মত কথার ভাব। তবু চুপ করে থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে বল্লাম—"আজ্ঞে, যাঁর দয়া হবে···নিতান্ত দায়ে পড়ে এসেছি—রাতের মত একটু আশ্রয় পাবো এই আশা করে। আবার সকাল হলেই—"

"হ্যা হ্যা হ্যা! সকাল হবারও দরকার হবে না, কিছু হাতাতে পারলেই গা-ঢাকা দেবে। তা কি আর বুঝি না? কিন্তু সে মতলব আর খাটছে না। আমি তোমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!"

এই মাত্র বলেই সে খপ্ করে আমার কোঁচার কাপড়টা ধরে ফেল্লে। তারপর হাঁকল—

"ওহে নফর! ও গোবিন্দ! এসো, এসো। আজ ধরেছি এক ব্যাটা বদ্‌মাসকে। এসো, এর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করা যাক।"

যুবার কথা শেষ হতে না হতেই হৈ-হৈ করে আরও তিন চারজন খেলোয়াড পাশা ফেলে আমার কাছে ছুটে এল। একজন আমার একটা কান সজোরে টেনে ধরে বল্লে :

"কি যাদু! বড্ড লোভ লেগে গেছে, না? তাই আজ আবার এসে জুটেছ!" সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠলো—"দাও না বেটাকে বেশ করে থাবড়ে! তারপর ওকে দিয়ে এসো পঞ্চায়েতের কাছে। বেটা টের পাক্ মজা।"

কথা শেষ করেই সে আমার দুই গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারতে শুরু করলে।

একেই তো আমার শরীরটা তখন ক্ষিদেয় আর পরিশ্রমে ঝিম্ ঝিম্ করছে, তার উপবে সেই নির্ম্মম চড়। মাথা ঘুরে, দু' চোখে অন্ধকার দেখে, আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না। জ্ঞান হ'লে দেখি, আমার চারিপাশে ইতর-ভদ্র অনেকগুলি লোক জড হয়েছে। একজন খোঁড়া ভিখারী-গোছের লোক একটা টিনের মগে ক'রে আমার মাথায় জল দিচ্ছে।

অনেকে অনেক কথাই বলাবলি করতে লাগল। বুঝলাম, তারা সকলেই ধরে নিয়েছে যে আমি চোর, আব তাদের গ্রামে ঢুকেছি চুরির মতলবেই। কিন্তু আমাব কাছে চোরাই মাল কিছু না থাকায়, কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করে আমাকে পুলিশে চালান দেওয়া যায় না। তবে আমাকে সেই রাত্রে গ্রামে থাকতে দিতে তারা মোটেই রাজী নয়। কাজেই আমাকে গ্রাম থেকে দূর করে দিতেই তারা কৃতসঙ্কল্প।

চৈতন্য পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই তারা আমাকে একটা সরু পথ দেখিয়ে বল্লে—"ভাল চাও তো এই পথ ধ'রে গ্রামের বাইরে চলে যাও—বুঝলে ছোকরা? ফের যদি তোমায় এ গ্রামে দেখি তো তোমার হাড় এক জায়গায় আর মাস এক জায়গায় করে ছাড়বো। যাও, যাও বলছি।"

তখনও আমার গা টলছে—শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে উপায় কি? সেই অবস্থায় টলতে টলতে সেই সরু আবার সেই মাঠের দিকেই চলতে লাগলাম।

গ্রামের সীমা পার হ'য়েই একটা চওড়া কাঁচা রাস্তা। সেই পথে পা দিতেই শুনলাম, আমার পিছন থেকে কে ডেকে বলছে—"ওগো বাবাঠাকুর! থামো। একটা কথা শুনে যাও।"

ডাকার সুরটা কর্কশ মোটেই নয়—বরং যেন একটু সহানুভূতি মাখা। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটা আমার কাছে আসতেই চিনলাম—সে সেই খোঁড়া ভিখারী, যে আমার মাথায় জল দিচ্ছিল।

ভিখারী বল্লে—"ভদ্দর লোকদের কাছে তো খুব সেবাই পেলে। এখন এই রাত্তিরে যাবে কোথায়? দু' ক্রোশের মধ্যে তো আর গাঁ নেই।"

বল্লাম—"না থাক্। মাঠ তো আছে? সেখানেই কোথাও পড়ে থাকবো। বনের শিয়াল-শুয়োরেরা এদের চেয়ে মন্দ ব্যবহার করবে না বোধ হয়।"

ভিখারী হাসলে। বল্লে:

"যা বলেছ বাবাঠাকুর! গরীবের দুঃখু কেউ বোঝে না। গরীবকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, উল্টে বলে কিনা চোর! আমি কিন্তু দেখেই বুঝতে পারি, কে ভাল লোক আর কে মন্দ! তাইতো তোমার পাছে পাছে এনু বাবাঠাকুর!"

এসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"যাবে কোথায়?"

বেটাকে ে তো সামনেই। ওইখানে বটগাছের তলায় আমি থাকি।

কাছে। ভিখারী মানুষ—আমার আর ঘরই বা কি, গাছতলাই বা কি!

কথা ক্ষু কি বাবাঠাকুর! রাতটার মত আমার আড্ডাতেই

মারতে সুরু। তেপান্তর মাঠের চেয়ে তো ভালো?"

শেষে রাঁধতেই হলো, শুকনো পাতা আর ডালপালার সাহায্যে

কতকটা আশ্বাস পেলাম। চৌদ্দ বছরের ছেলে—একা-একা মাঠে পড়ে থাকা কি সম্ভব? বল্লাম—'সে তো ভালোই, কিন্তু তোমার কোন কষ্ট হবে না তো?"

—"শোনো কথা। গাছতলায় একা পড়ে থাকি। একটা সঙ্গী যদি জোটে, সে তো ভাল কথাই। কষ্টের বদলে তবু একটা রাতও তো একটু আনন্দে কাটবে! তুমি চলো বাবাঠাকুর, ওসব বাজে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।"

অগত্যা তার আড্ডাতেই এসে উঠলাম। গ্রামের শেষে, মাঠের ধারেই একটা পুকুর। তার পাড়েই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ চারিপাশে ঝুরি নামিয়ে অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। ভিখারীর সঙ্গে তারই তলায় এসে দাঁড়ালাম।

গাছের গোড়ায়, দু' পাশের দুটো মোটা মোটা ঝুরির মাঝখানে ভিখারীর আড্ডা। তার মাথার উপরে খুব মোটা একটা ডাল ঘন পাতার বোঝা কাঁধে নিয়ে সেই আড্ডাটির ছাদের মত হয়ে আছে।

ভিখারী আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালে। বল্লে—"বাবাঠাকুরের সারাদিন খাওয়া জোটেনি, তা তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা, এক কাজ কর বাবাঠাকুর! আমার ঝুলিতে চাল, আলু আর গোটা দুই বেগুন আছে। একটা মাথা-ভাঙা নতুন হাঁড়িও যোগাড় করে রেখে দিয়েছি। পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দাও। তোমারও হবে আমারও হবে—কি বলো?"

আমি আপত্তি করলাম। সে কি! একে দীন ভিখারী, তার

খোঁড়া। তার অতি কষ্টে ভিক্ষে-করা অন্ন ধ্বংস করতে হবে? সে কিছুতেই হ'তে পারে না। প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু ভিখারী ভয়ানক জেদ করতে লাগলো। বল্লে—"তা হ'লে আমাকেও আজ উপোস দিতে হয় বাবাঠাকুর! ব্রাহ্মণের ছেলে, তায় ছেলেমানুষ! সারাদিন না খেয়ে আমারই কাছে শুকিয়ে পড়ে থাকবে, আর আমি মজা করে খেয়ে ঘুমুবো? তোমার বড়লোকেরা তা পারে বাবাঠাকুর, কিন্তু আমরা দীন-দুঃখী, আমরা তা কিছুতেই সইতে পারি না। তা হ'লে থাক্ রান্না, আমিও তোমার মত শুকিয়ে পড়ে থাকি।"

মুস্কিলের কথা! আমার জন্যে গরীব বেচারী উপবাসে থাকে, তাই বা হয় কি করে? আর আমিই বা ভদ্রসন্তান হয়ে দীন ভিখারীর অন্নে ভাগ বসাই কোন্ হিসেবে? উভয় মুস্কিলে প'ড়ে গেলাম।

বিস্তর কথা কাটাকাটি করলাম, কিন্তু ফল কিছুই হ'লো না। ভিখারীর সেই এক কথা—"তুমিও সারাদিন খাওনি, আমিও না. এখন তুমি না খেলে আমিই বা খাবো কোন্ মুখে? আমি সব যোগাড় করে দিচ্ছি, তুমি রাঁধো। না হয় এসো, দু'জনেই শুয়ে পড়া যাক্।"

শেষে রাঁধতেই হ'লো। শুকনো পাতা আর ডালপালার সাহায্যে ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিয়ে বটপাতার থালায় বেশ তৃপ্তির সঙ্গে দু'জনে খাওয়া শেষ করলাম। তারপর পুকুরে আঁচিয়ে, পুকুর থেকেই আঁজ্‌লা করে জল খেয়ে আবার গাছতলায় ফিরে এলাম। সারাদিনের উপবাসের পর ভিখারীর যত্নের নিবেদন-স্বরূপ সেই

গাছতলার ভাতে-ভাত এত তৃপ্ত এনে দিল যে, আমার সেই চৌদ্দ বছর বয়সে এমন তৃপ্তির খাওয়া একদিনও খেয়েছি বলে স্মরণ করতে পারলাম না।

তারপর দু'জনেই শুয়ে পড়লাম। ভিখারীর সঙ্গে অনেক কথাই হ'লো। শুনলাম, সেও এককালে গৃহস্থই ছিল। একখানা আটচালা ঘর, গোয়াল, একটা ছোট পুকুর আর বিঘে দশেক ধানের জমি নিয়ে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই তার দিন কাটতো। গোলায় তার বছরের ধান মজুত থাকতো, আর তার স্ত্রী নিজের হাতে লাউ, কুমড়ো, ঢেঁড়স, বেগুন, সীম, পুঁই ইত্যাদি শাক-সাব্জির চাষ করতো বাড়ীর উঠোনে আর তার আশে পাশে। তাতে বেশ শান্তিতে তাদের দিন কেটে যেতো।

কিন্তু বরাত মন্দ, তাই চার বছর উপর্যুপরি হ'লো অজন্মা। গোলা শূন্য, ক্ষেতেও শস্য নেই। বাধ্য হয়ে গ্রামের এক ব্রাহ্মণের কাছে বসতবাড়ী আর ধানের জমি বন্ধক দিয়ে নিতে হ'লো একশো টাকা। সে টাকা আর কিছুতেই শোধ হ'লো না। ভিখারী আট-দশ কিস্তিতে প্রায় আশী টাকা তার ব্রাহ্মণ মহাজনকে দিয়েছিলো বটে, কিন্তু তাতে সুদটাও উশুল হয়নি—আসল তো দূরের কথা। শেষে তিনি গরীবের যথাসর্ব্বস্ব নীলাম করে নিলেন। গরীব খোঁড়া তার স্ত্রী আর একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে পথে এসে দাঁড়ালো।

তারপর এক বৎসর যেতে না যেতে, না খেতে পেয়ে তার স্ত্রী আর ছেলে, একে একে সরে পড়লো। খোঁড়ার অখণ্ড পরমায়. তাই সে নিজেই শুধু বেঁচে রইলো—এইভাবে ভিক্ষে করে খেয়ে গাছতলায় পড়ে থাক্‌তে।

সারাদিনের উপবাস আর দারুণ পরিশ্রমের পর পেটে ভাত পড়তেই শরীর আমার একেবারেই এলিয়ে পড়েছিল। ঘুমে চোখ দুটো এমন জড়িয়ে আসছিলো যে, আমি চেষ্টা করেও চাইতে পারছিলাম না। কিন্তু ভিখারীর এই কথা শুনে আমার সে-ঘুম কোথায় চলে গেল, আর আমার শরীর যেন কিসের একটা মাদকতায় গরম হয়ে উঠলো!

ভাবলাম, কি সর্ব্বনাশ! মানুষের উপর মানুষের এত অত্যাচার? সামান্য বিষয়ের লোভে গরীব গৃহস্থের এই রকম করে সর্ব্বনাশ সাধন করলে! এরাই আবার ব্রাহ্মণ? এরাই আবার মুখে ধর্ম্মের বুলি কপচে বেড়ায়? দুনিয়াটা তো কেবল ফাঁকিবাজী, কেবল অবিচারের রাজ্য। নইলে এরাই আবার নিজেদের দেবতার সমকক্ষ প্রচার ক'রে অপরকে অশুচি, অস্পৃশ্য করে দিতে সাহস করে? অস্পৃশ্য তো এরাই, যারা ভান করে শ্রেষ্ঠত্বের, কিন্তু ব্যবহার যাদের ইতর জাতির চেয়েও নিকৃষ্ট।

মনে পড়লো, আমিও তো কম অত্যাচার ভোগ করিনি! সংসার নির্য্যাতন. রামতারণবাবুর বিশ্বাসঘাতকতা, গ্রামবাসীদের অত্যাচার —একে একে সব কথাই আমার মনে উদয় হ'তে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রামের ভদ্র গৃহস্থদের আচরণের কথাও মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

মনে হলো, কি আশ্চর্য্য! যারা বড়লোক, যারা ভদ্র, তাদের কি সকলেই এমন পাপের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি? তারা কি সবাই এমন স্বার্থপর? অশিক্ষিত, অসভ্য, আর দীন-দরিদ্র যারা, তাদের মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, কই, এ-সব ভদ্রনামধারী অবস্থাপন্ন

লোকদের মধ্যে তো তা নেই। তবু এরাই সভ্য আর গরীবেরা অসভ্য? হায় ভগবান, এই তোমার বিচার?

মনের আবেগে ভগবানের নামটা সত্য সত্যই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো। ভিখারী তা শুনতে পেলে। বল্লে—"ভগবানকে ডাকছো বাবাঠাকুর? ও-নাম আর করো না। ভগবান নেই, থাকলে কি আর এমনটা হতে পারতো? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জগতে যারা পরের সর্ব্বনাশ ক'রে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে, তারাই রয়েছে বেশ সুখে আর শান্তিতে। আর, তোমার-আমার মত যারা নিজের দিকে চাইতে শেখেনি, যারা অধর্ম্ম করতে ভয় পায়, তাদেরই যত কষ্ট, যত অশান্তি। ভগবান থাকলে কি এর একটা বিচার হতো না বাবাঠাকুর? তাই বলছি, ভগবান নেই। ওটা যত সব ভণ্ড বদমায়েসদের ধাপ্পাবাজী।

ভগবানের নাম নিয়ে, কিংবা তার দোহাই দিয়ে ছোটলোকদের ভোলানো খুব সোজা। তাই এসব ব্রাহ্মণ আর ভদ্রলোকেরা ছোট জাতের কাছে ভগবান দেখিয়ে বেড়ায়; কিন্তু আসলে তারা ভগবানকে একদম মানে না। দেখছ না যারা যত ধর্ম্মের বুলি আওড়ায়, তারাই তত বেশী অধর্ম করে থাকে? নইলে ব্রাহ্মণ হয়ে কি দীন-দরিদ্র শূদ্রের সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিতে পারত? অথচ তার তো কোন ক্ষতি হয়নি। উচ্ছন্ন যেতে আমিই গিয়েছি। আমার ছেলে, বউ, না খেতে পেয়ে পথেই প'ড়ে মরলো, আর তিনি দিব্যি আরামে আমার সম্পত্তি ভোগ করে যাচ্ছেন!

শুধু কি তাই? শোনো বাবাঠাকুর! সে একদিনের তরে আমাকে একমুঠো ভিক্ষেও দেয়নি। আবার ব'লে বেড়ায় যে,

আমি ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিতে গিয়েছিনু, সেই মহাপাপে আমার এই দশা হয়েছে। ওঃ! তোমার ভগবান থাকলে এতটা কি তাঁর সহ্য হতো বাবাঠাকুর?”

ভিখারী আরো কত কথাই বলতে লাগলো। বুঝলাম, তার বুকেও একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি চাপা পড়ে আছে।

যাক্। শেষে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হতেই ভিখারী আমাকে ডেকে দিলে। বল্লে

“যেতেই তো হবে তোমাকে বাবাঠাকুর, তবে আর বেলা বাড়িয়ে লাভ কি? এখনি বরং ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ পথ চলতে পারবে। তুমি এই মুখে যাও। ইদিকে ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে দু'একটা বড় গ্রাম আছে। সেখানে হয়তো তোমার কোন উপায় হতে পারে। না হয়, আরও কয়েক ক্রোশ গেলে ভাল সহর পাবে। সেখানে কাজকর্ম্ম কিছু পেলেও পেতে পারো।”

তারপর সে তার ঝুলির ভিতর থেকে একটা আধুলি ব'ার ক'রে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লে:

“এটা তোমার কাছে রেখে দাও বাবাঠাকুর। দেশের যে রকম হাওয়া, তাতে সব দিন যে ভাত জুটবে, তা মনে করো না। ছেলে-মানুষ—ক্ষিদেয় কষ্ট পাবে। এটা থাকলে তবু মাঝে মাঝে কিছু কিনে দিন কাটাতে পারবে। একদম্ রিক্ত হয়ে কি বিদেশ-বিভুঁয়ে যাওয়া চলে?”

আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম—“কি সর্ব্বনাশ! দীন ভিখারী তুমি, আমাকে আধুলি দান করছ? আর আমি তাই

হাত পেতে নেবো? তুমি বলো কি! এও কি কখনো সম্ভব হতে পারে?"

আমিও নেব না, সেও ছাড়বে না। অনেকক্ষণ ধ'রে উভয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি চল্লো। শেষে সে বল্লে—"আচ্ছা বাবা-ঠাকুর। ধরো আমি তোমাকে আধুলিটা ধার দিচ্ছি। তোমার যখন সময় হবে, তখন তুমি সুদে-আসলে এটা শোধ দিও। আমাকে নয়—আমি হয়তো ততদিন বেঁচে থাকবো না। আমার মত যে কোন গরীব, বা যে-কোন দুঃখীকে দিলেই তা আমারই পাওয়া হবে।

আমি মানি, আর আমি বিশ্বাস করি যে, এই পৃথিবীতে যারা হতভাগা, যারা দীন-হীন, তারা সকলেই আমার ভাই, আমার আপনার লোক। তুমিও যদি সেই হিসেবে আমাকে তোমার আপনার মনে করো, তা হ'লে আমার দেওয়া এই সামান্য সাহায্যটা আজ তোমাকে নিশ্চয় নিতে হবে। নইলে বুঝবো যে, তুমি ভদ্র-ঘরের ছেলে, তাই আমাকে ঘৃণা কর, আর সেই জন্যেই এটা নিচ্ছ না।"

এর উপরে আর কথা চ'ল্লো না। দীন—ভিখারী আর নিঃস্ব হলেও, সে আমার প্রতি যে উদারতা আর সহৃদয়তা দেখিয়েছে, এর আগে তেমনটি আর কোথাও পাইনি। এর কাছে ঋণী হওয়ায় লজ্জা নেই—বরং তা গৌরবেরই কথা।

যাক্। আধুলিটা নিতেই হলো। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারই নির্দ্দিষ্ট পথে পা চালিয়ে দিলাম। তার ব্যবহার আর তার উপদেশের কথা ভাবতে ভাবতে চার-পাঁচ-ক্রোশ পথ

এক রকম বিনা কষ্টে অতিক্রম করে বেলা দুপুরের কিছু আগেই একটা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম।

নদীর ওপারেই একটা গঞ্জ। একটা খেয়া নৌকো প্রায় পনেরো জন যাত্রী নিয়ে ছাড়বার উপক্রম করছে। মাঝি তাড়া দিতেই কোন কিছু বিচার না করে তাড়াতাড়ি নৌকোয় গিয়ে উঠ্‌লাম।

নৌকোতে একটি বাবু-গোছের লোক আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। কয়েকজন ইতর শ্রেণীর লোক বোধহয় তাদের মজুরী নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি লাগিয়েছে। অবশেষে ভদ্রলোকটি একটা গেঁজে বা'র করে তাঁর টাকা-পয়সা গুণতে সুরু করলেন।

আমি সেই বাবুটির কাছ থেকে হাত দুই দূরে বসে আছি। ভাবছি, সেই গঞ্জে গিয়ে কোন রকম কাজকর্ম্ম যোগাড় করা যাবে কিনা, না হয় তো আবার কোথায় যাবো, কি করবো ইত্যাদি।

ভিখারীর দেওয়া আধুলিটি বা'র করে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম,—এ থেকে দু' পয়সা পারের জন্য দিতে হবে। তারপর অন্ততঃ দু' পয়সার কিছু খাওয়া চাই। ভিখারীর দয়ায় ৪।৫ দিন প্রাণটা কোন রকম করে বাঁচাতে পারবো। এর মধ্যে কোন উপায় কি আর হবে না? ওঃ! ভিখারী আমার কি উপকারই করেছে! এমন নিঃসহায় দীন-দরিদ্র, অথচ তার এতখানি মহৎ প্রাণ!

একমনে এই সব কথা ভাবছি, এমন সময়ে হঠাৎ বাবুটি ব্যস্ত-ভাব দেখাতে দেখাতে ব'লে উঠ্‌লেন—"ওই যা! আধুলিটা, আধুলিটা কে নিলে? এই যে এইমাত্র এখানে রাখলুম! কোথায় গেল?"

বাবুর সঙ্গে মজুরেরাও ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। খোঁজ, খোঁজ, কিন্তু

সেটা পাওয়া গেল না। বাবুটি বল্লেন, "সে কি কথা। এইমাত্র বা'র করলাম, আর উড়ে গেল ? তা হ'তেই পারে না। নিশ্চয় তোরা কেউ সরিয়েছিস্। দেখি, তোদের গাঁট দেখি।"

মজুররা ভয়ে ভয়ে তাদের সব দেখালে। কিন্তু আধুলি বেরুলো না। তখন সন্দেহটা আমার উপর এসে পড়লো। বাবুটি বল্লেন—"এই ছোকরাটিকে তো চিনি না। অথচ এ আমাদের এক রকম গা ঘেঁসেই ব'সে আছে। ওর কাপড়-চোপড় ঝেড়ে ঝুড়ে দেখতো।"

তখন সবাই মিলে আমাকে নিয়ে পড়লো।

ভিখারীর দেওয়া আধুলিটা আমার কোঁচার খুঁটেই বাঁধা ছিল। খোঁজাখুঁজির ফলে সেইটে তারা টেনে বার করলে। তখন "চোর! চোর! আধুলি চুরি করেছে" বলে তারা সকলে মিলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুল্লে।

আমি কত বল্লাম, কত দিব্যি করলাম, কিন্তু সে-কথা কে-ই বা শোনে, কে-ই বা মানে ? বিশেষ, ভিখারীর কাছ হতে আধুলি পেয়েছি শুনে তারা উপহাসের হাসি হাসতে লাগলো।

বাবুটি রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে মার খেলাম খুব। সঙ্গে সঙ্গে আধুলিটাও তিনি কেড়ে নিলেন। বল্লেন—"যা বেটা চোর! অন্য কেউ হ'লে তোকে পুলিসে দিত। কিন্তু আমি নিতান্ত ভাল মানুষ বলেই তোকে ছেড়ে দিলাম। সাবধান, আর কখনো পরের ধনে লোভ করবি না।"

তারপর নৌকো ঘাটে লাগতেই তারা সব চলে গেল। মাঝি খেয়ার পয়সা চাইতেই আমি মুস্কিলে পড়ে গেলাম। বল্লাম,—

"দেখলে তো ? আমার কাছে একটি মাত্র আধুলি ছিল, তাও বাবুটি মেরে ধরে কেড়ে নিলেন। আমি এখন পারের পয়সা কোথা থেকে দেবো ?"

মাঝি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কি সে বুঝলো, তা সেই জানে। শেষে বল্লে—"কি জানি বাবু! ওরা বল্লে, তুমি চুরি করেছ। কিন্তু তোমার মুখ দেখে আমার তা মনে হয় না। যাই হোক, তোমার কাছে যখন আর পয়সা নেই, তখন আর ধরপাকড় করেই বা কি হবে ? যাও—তোমায় আর পয়সা দিতে হবে না।"

মনে ভাবলাম, মাঝির কাছে যে আর মার খেতে হলো না, এই আমার পরম সৌভাগ্য। যা হোক, ভিক্ষুকের দেওয়া এত বড় একটা শেষ সম্বল—আধুলি হারিয়ে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে আর মনে মনে ভদ্রলোকটির মুণ্ডুপাত করতে করতে আমি বিমর্ষ মুখে গঞ্জের দিকে চল্লাম।

দশম

পারের ঘাট থেকে রশি দুই দূরেই গঞ্জ। সেদিন হাটবার। দুপুর হ'তেই হাট বেশ জমে উঠেছে। লোকে লোকারণ্য। বেচা-কেনা খুব জোর চল্‌ছে। হরেক রকম তরি-তরকারী, ফল-মূল, মাছ, খাবার আর শিল্পদ্রব্য এক-এক স্থানে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। বিস্তর ঝাঁকামুটে সারা হাটময় ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে।

সবাই মহা ব্যস্ত। সকলেই একটা না একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে আমিই কেবল উদ্দেশ্যহীন। আমার না আছে পয়সা, না আছে কোন কাজ। কেবল দারুণ ক্ষুধার জ্বালা আমার পেটের মধ্যে আগুনের মত জ্বলছে।

নিরুপায় ভাবে সারা হাটময় আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। বস্তা বস্তা মুড়ি, মুড়কী, বাতাসা পাইকারী দরে বিক্রি হচ্ছে। আমি সতৃষ্ণ নয়নে কেবল চেয়ে দেখি। রাশি রাশি পাকা কলা, আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল ইত্যাদি স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। লোলুপ দৃষ্টিতে আমি কেবল সেগুলির দিকে চেয়ে দেখি। পয়সা নেই যে, সামান্য কিছু কিনে খাই, আবার কারো কাছে চাইতেও সাহস হয় না—কি জানি, শেষে কি আবার হাটের মধ্যে মার খেয়ে ম'রবো ?

তখন আধুলিটার কথা কেবলই মনে হ'তে লাগলো। হায় রে! সেটা থাকলে কি আজ আমাকে এই হাটের মধ্যে ক্ষিদেয় কষ্ট পেতে হ'তো ? দু'পয়সার কিছু খেয়েও তো জল খেতে পারতুম ? আমার কষ্ট হবে ভেবেই সেই দীন ভিখারী তার সামান্য পুঁজি থেকে তা দান করেছিল! আর সেটা কিনা একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক জোর করে ছিনিয়ে নিলে ? তাও এম্নি নয়—রীতিমত মার দিয়ে।

কথাটা মনে হতেই, বুকটা আমার টন্ টন করে উঠ্‌লো। চোখ ফেটে আপনা আপনিই ঝরে পড়লো ফোঁটাকয়েক চোখের লোনা জল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, এক স্থানে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময়ে একটি

ভদ্রলোক প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল হাতে করে আমার কাছে এসে বল্লেন :

"ওহে ছোকরা। মোট নিবি? এই কাঁঠালটা নিয়ে যেতে পারবি?"

বল্লাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কতদূর যেতে হবে?"

ভদ্রলোক বল্লেন—"এই কাছেই। আধপোয়াটাক পথ হবে। নে. ধর্—দু'-পয়সার বেশী পাবি না কিন্তু।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাঁঠালটা তিনি আমার মাথায় চাপিয়ে দিলেন। আমিও কোন ওজর আপত্তি না করে, কাঁঠাল নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চল্লাম।

ভদ্রলোক বলেছিলেন "আধপোয়া পথ"; কিন্তু চল্তে গিয়ে দেখি যে, আধপোয়া পথ আর ফুরোয় না। তিন-চারটে মোড়, দুটো বাগান পার হয়ে একমাইলের উপর এলাম, তবু তাঁর বাড়ির নাগাল পেলাম না! এদিকে প্রায় পনেরো সের ওজনের কাঁঠালটা আমার মাথায় ক্রমেই চেপে বসতে লাগলো। পেটে অন্ন নেই. মাথায় দারুণ বোঝা—চোদ্দ বছরের ছেলের পক্ষে সেটা সোজা কথা নয়।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বল্লেন—"ওই যে সুমুখে ওই বটগাছ; তার ও-পাশেই। এরই মধ্যে এলিয়ে পড়লি? আচ্ছা বাবু মুটে তো! দুটো পয়সা কি এম্নি আসে হে ছোকরা? রোজগার এত সোজা নয়।"

শরীরটা যেন রি-রি করে উঠলো। আচ্ছা পাষণ্ড লোক তো! ইনি আবার ভদ্রলোক? হাড়ী, মুচি. চামারদের যেটুকু বিচার-

বিবেচনা আছে, এঁর তার শতাংশের এক অংশও নেই। তবু ইনি বাবু?

যাক্। আমি কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে কাঁঠাল নিয়ে চলতে লাগলাম।

আরও পোয়াটাক গিয়ে তাঁর বাড়ী পেলাম। কাঁঠালটা তিনি ঘরে তুল্লেন, কিন্তু পয়সা দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমার তখন ক্ষিদে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ভাবছি পয়সা দুটো পেলেই যা হোক কিছু কিনে খাবো। একটা চিড়ে-মুড়কীর দোকানও সেখানে রয়েছে দেখলাম। কিন্তু পয়সা যে তিনি-দেবার নামটি করছেন না। ব্যাপার কি?

শেষে আর সহ্য হ'লো না। বল্লাম—"দিন না মশাই পয়সা দুটো! আধপোয়া বলে দেড় মাইল তো টেনে আনলেন। এখন পয়সা দুটো দিন।"

তাতেই ভদ্রলোকের মানে ঘা লেগে গেল। মুচি-মুদ্দফরাসের মত আচরণ করতে লজ্জা হয় না, কিন্তু গরীবের মুখে একটি ন্যায্য কথা শুনলেই মহা অপমান হয়ে পড়ে। দেখলাম যে, ইনি সেই রকমের ভদ্রলোক। আমার কথায় রেগে গিয়ে তিনি উত্তর করলেন:

"কি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমি তোর কাছে মিথ্যে কথা বলেছি? ব্যাটা ছোটলোক! ব্যাটা পাজী!"

বল্লাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ছোটলোক না হ'লে, মোট বইতেই বা আসবো কেন? তা, পয়সা দুটো দিন। আমায় আবার অতদূর ফিরতে হবে তো?"

বাবুটির গৃহিণী তখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলে উঠলেন—"বাবা। এতটুকু ছেলে, টক্ টক্ করে উত্তর করে তো খুব। সাধে কি বলে ছোটলোক? তা বাছা! তোমার পয়সা কি দেবো না বলেছি? তবু শুধু একটা কাঁঠাল বয়েই দু'-দুটো পয়সা নেবে? এই চ্যালা কাঠ ক'টা তুলে দাও, পয়সা দিচ্ছি।"

তিনি আমাকে উঠানের মাঝখানে রাশীকৃত প্রায় এক গাড়ীটাক চ্যালা কাঠ দেখিয়ে দিলেন।

কি সর্ব্বনাশ! এই কাঠের বস্তা আমায় তুলতে হবে? তবে আমি পাব মজুরীর দুটো পয়সা? এরা মানুষ না পিশাচ? ভাবলাম, ওদের পয়সার মাথায় ঝাঁটা মেরে তখনই চলে আসি। কিন্তু তখন বড়ই নিরুপায়। তেমন অবস্থায় ওই দুটো পয়সা আমার কাছে দু'টাকা। কাজেই তার মায়া ছাড়তে পারলাম না।

আধঘণ্টা খেটে, কাঠগুলো তুলে দিলাম। তাতেও নিষ্কৃতি নেই! যেমন চামার বাবু, তেম্নি চামারাণী তাঁর গৃহিণী! তার আদেশে শেষে উঠোনটাও ঝাঁট দিয়ে তবে রেহাই পাই। ভদ্রলোকেরা গরীবদের খাটিয়ে কি রকম মজুরী দিয়ে থাকেন, সেদিন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম।

তখন অপরাহ্ণ হয়ে গেছে। ক্ষিদেয় আর দাঁড়াতে পারছি না। পয়সা দুটো পেয়েই, সেই দোকান থেকে দু' পয়সার যবের ছাতু কিনে নিলাম। নিকটেই একটা পুকুর ছিল। কোঁচার মুড়োয় ছাতু বেঁধে সেই পুকুরের জলে ডুবিয়ে তা ভিজিয়ে নিলাম। তারপর রাক্ষসের মত সেগুলো খেয়ে, আঁজলা আঁজলা করে পুকুরের জল পান করতে, তবে প্রাণটা বাঁচলো।

কিন্তু দেহ আর বইতে চায় না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে ; যেখানে হোক এক জায়গায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অপরিচিত গ্রামে থাকতে সাহস হয় না। আবার কি চোরের বদনাম নিয়ে মার খেয়ে ম'রতে হবে ? এ গ্রামের একটা গৃহস্থের যা নমুনা দেখলাম, তাতে এটা ভদ্রপল্লী বলতে ইচ্ছা হয় না! অগত্যা আবার সেই গঞ্জের দিকেই চলতে সুরু করলাম।

তখন হাট ভেঙে গিয়েছে। বড় বড় চালাগুলো সব খালি। তারই একটাতে কতকগুলো কুড়োনো খড় পেতে বিছানা তৈরী করে নিলাম। দেহটা ক্লান্ত হয়েছিল খুবই। কাজেই শুতে না শুতে একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। এক মেথর আর এক মেথরাণী হাট ঝাঁট দিতে সুরু করেছে। আমাকে দেখে মেথরাণী বল্লে—"তুমি তো দেখছি বেশ ভদ্রলোকের ছেলে বাবু! তবে হাটের চালায় একা একা শুয়েছিলে কেন? এখানে যে নেকড়ে বাঘ আসে বাবু!"

বললাম—"কি করি বলো? বিদেশী লোক। কেউ হয়তো বিশ্বাস করে জায়গা দেবে না। তাই এই হাটেই পড়ে ছিলুম।"

মেথরাণী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। পরে বল্লে—"যাবে কোথায়?" বললাম—"বেরিয়েছি কাজের সন্ধানে! কোথায় যে কাজ মিলবে, তা তো জানি না।"

"ওরে মোর কপাল! তুমি কাজ খুজতে এসেছ এই গাঁয়ে? এখানে সব চাষী লোকের বাস। ভদ্দর নোকেরাও চাষবাস করে খায়। এখানে কি চাকরী মেলে? তবে যদি রায়পুরে যেতে

পারো তো এক-আধটা কাজ মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু সে তো এখান থেকে পনেরো ক্রোশ! পারবে ততদূর যেতে?”

পনেরো ক্রোশ? বাবা! সে তো তা হ'লে দু'দিনের পথ! এ দু'দিন আমি কি খেয়ে পথ চল্‌বো? তারপর সেখানে পৌঁছুলেই তো আর কাজ মিলবে না। সে কয়দিনই বা কি করে চলবে? পোড়া পেটই দেখছি আমার কাল হ'য়ে উঠলো।

আধুলিটার কথা আবার মনে পড়লো। খোঁড়া ভিখারী এই কথা ভেবেই তার সামান্য পুঁজি থেকে আমাকে সেটা দান করেছিল। সে ভুক্তভোগী, নিঃসম্বলের যে কত কষ্ট, সে তা ভাল রকমেই জান্‌ত। আর সে আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবেসেছিল। প্রবাসে, অনির্দ্দিষ্টের পানে চলতে গিয়ে পেটের চিন্তাটাই যে আমার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, সে তা স্পষ্ট ভাবেই বুঝে নিয়েছিল। তাই আমাকে সে চিন্তার হাত থেকে যথাসম্ভব নিষ্কৃতি দেবার জন্যেই এমন পীড়াপীড়ি করেও সে তার কত দিনের ভিক্ষার সঞ্চয়টি অবাধে, সরলান্তঃকরণে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—“দেশের যে রকম হাওয়া, তাতে সবদিন যে ভাত জুটবে, তা মনে করো না। ছেলেমানুষ—ক্ষিদেয় কষ্ট পাবে; এটা থাকলে তবু মাঝে মাঝে কিছু কিনে খেয়ে দিন কাটাতে পারবে। একদম রিক্তহস্ত হয়ে কি বিদেশ-বিভুঁয়ে যাওয়া চলে?”

ওঃ! ভিখারী কতখানি চিন্তাই করেছিল আমার জন্যে! কিন্তু আমার বাবা কখনো আমার জন্যে এর সিকি ভাবনা ভাবেননি; জ্ঞাতিরা তো নয়ই। এক ছিল ইচ্ছের মা, যে তার শক্তি দিয়ে সাধ্যমত আমার উপকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার

রাতের অন্ধকারে লাঠির ওপর ভর দিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ যাব এগিয়ে চলে

ভাগ্যদোষে হঠাৎ মৃত্যু এসে তাঁকে তুলে নিয়ে গেল। এই কি ভগবানের বিচার? সাধে কি ভিখারী বলেছিল যে, ভগবান্ নেই? ওটা যত সব ভণ্ড বদমায়েসদের ধাপ্পাবাজি? ভগবান্ থাকলে কি আর সেই ভিখারীর দেওয়া আধুলিটা আমার মত নিঃসহায়, নিঃসম্বল দীন দরিদ্রের হাত থেকে একটা অজানা, অচেনা, অর্থবান ভদ্রলোক মারধোর করে ছিনিয়ে নিতে পারতো?

একমনে এই রকম কত কথাই ভাবছি দেখে মেথরাণী বল্লে—"বুঝেছি বাবু। তুমি বড় ভাবনায় পড়েছ। কিন্তু কি করবে বলো? গরীবের ভাবনা ছাড়া আছেই বা কি? তা এক কাজ করো বাবু। তোমাকে দেখে আমার মায়া হচ্ছে, তাই বলছি।

ওই যে ওধারে একটা চালের আড়ৎ দেখছ, ওটা হ'লো হরিবাবুর। তিনি খুব ভাল লোক। প্রতি হাটের পরদিন তিনি তাঁর এক গাড়ী করে ধান রায়পুরের ধানকলে পাঠান চাল তৈরী করাতে। আজও সেই রকম ধান যাবে। তাঁকে রাজী করাতে পারলে, চাই কি সেই গাড়ীতেই যেতে পারো। দেখ না, ওঁকে যদি রাজী করাতে পারো।"

পরামর্শটা মন্দ লাগলো না। দেখলুম, মেথরাণী হ'লে কি হয়, তার মনটা বেশ সরল, আর সে আমাকে সুযুক্তিই দিয়েছে। তারই কথামত আমি হরিবাবুর কাছে গেলাম আর তাঁকে আমার দুর্দ্দশার কথা খুলে বল্লাম।

হরিবাবু ধনী ব্যবসাদার হ'লে কি হয়, তিনি বাবু মোটেই নন। নিজেকে তিনি ভদ্রলোক ব'লে পরিচয় দিতেও চান না। পরণে

একটা আধময়লা পাঁচহাতি কাপড় আর গলায় মালা—কে বলবে যে, তিনি হরিবাবু আর অতবড় একজন আড়ৎদার ?

গলায় পৈতা দেখেই তিনি আমাকে একটা লম্বা-চওড়া প্রণাম করে বসলেন। দেখলাম, ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি। অথচ এই ব্রাহ্মণেরাই আজকাল কত নীচ, কত হীন হয়ে পড়েছে! হরিবাবু প্রণাম করতেই এই কথা ভেবে আমার নিজেরই মনে লজ্জা হতে লাগলো—আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম।

যাক্। আমার সব কথা তাঁকে খুলে বল্লাম। তিনি জিভ কেটে উত্তর দিলেন—"সে কি! আপনি ব্রাহ্মণ, তায় ছেলেমানুষ। বিদেশে এসে এমন মুস্কিলে পড়ে গিয়েছেন। আপনাকে একটু সাহায্য করবো, এ তো আমার ভাগ্যের কথা! টাকা নয়, কড়ি নয়, শুধু গাড়ীতে বসে যাবেন। তাতে আর আপত্তি করবার আছেই বা কি? গাড়ী তো আমার যাচ্ছেই—তা নয় আপনি একজন সঙ্গী হ'লেন। সে তো ভাল কথাই। তা বেশ। যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন এবেলা এখানেই রসুই করুন, খান দান, তারপর বৈকালে রওনা হবেন। ব্রাহ্মণ মানুষ—দেবতা। আমার বাড়ী এসে কি অভুক্ত থাকবেন? তা তো হয় না।"

হাতে হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেলাম! ভাগ্যিস্ মেথরাণীর কথা শুনে এখানে এসেছিলাম। তাইতো এতটা সুবিধে হয়ে গেল! মেথরাণীকে নীচ জাতি বলে ঘৃণা করলে কি আজ কষ্টের অবধি থাকতো?

হরিবাবু যথেষ্ট সেবা করলেন। স্নানান্তে নিজেই পাক করলাম আতপ চাল, ঘি, আলুভাতে, দুধ, চিনি, কলা—

একেবারে রাজভোগ। হরিবাবু আমারই পাতে প্রসাদ পেলেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম ব্রাহ্মণদের ওপর তাঁর এই ভক্তি দেখে।

বৈকাল চারটের সময় মোষের গাড়ী ছাড়লো। গাড়ীতে বত্রিশ বস্তা ধান। সওয়ার আমি, আর একটা গাড়োয়ান। গাড়োয়ানকে আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়ে, হরিবাবু আমায় আবার প্রণাম করলেন। তারপর প্রণামীস্বরূপ আমার হাতে দিলেন একটি টাকা। বল্লেন—"ব্রাহ্মণ আপনি—অপরাধ নেবেন না, এটি আপনার পথে জল খাবার জন্যে।"

আপত্তি করতে সাহস হ'লো না। খুসী মনেই টাকাটা নিলাম। তারপর গাড়ী ছেড়ে দিলে।

এগারো

একে মোষের গাড়ী, তায় পুরোদস্তুর বোঝাই। কাজেই পথ যেন আর এগোয় না! বেলা চারটে থেকে চলতে সুরু ক'রে, রাত বারোটার সময় একটা আড্ডায় এসে থামলো। দূর-পথের গাড়োয়ানেরা সেইখানেই রেঁধে বেড়ে খায়। আমার সঙ্গী গাড়োয়ানটাও গাড়ী খুলে দিয়ে, মোষ দুটোকে জাব দিলে। তারপর সে রান্না সুরু করলে।

আমার পেট তখনও ভার—কাজেই আমি আর কিছুই খেলাম না। তৎক্ষণে ধানের বস্তার উপর শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে লাগলাম। গাড়োয়ান খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার দুটোর সময় গাড়ী ছেড়ে দিলে।

রায়পুরের ধানকলে পৌঁছলাম পরদিন বেলা দশটায়। গাড়োয়ান তার নিজের কাজে মন দিলে। আমিও তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চল্লাম ওই গ্রামের কোথাও একটা কাজের সন্ধান করতে।

কিন্তু সারাদিন ঘুরেও কোন উপায় করতে পারলাম না। একে বিদেশী, তায় ছেলেমানুষ। কাজেই কথা বল্লেই লোকে হেসে উড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। কেউ বলে—"চেহারাটা আছে ভাল—যাত্রার দলে মেশো না কেন হে ছোকরা! মাইনেও পাবে, আর খেতেও দেবে।"

কেউ বলে—"গরু চরাতে পারবে? বলো তো দামু ঘোষকে বলে দি। সে তোমাকে পেটভাতে রাখতে পারে।"

একটি বড়লোককে চাকরীর কথা বলতেই তিনি মহা বিরক্ত হয়ে উঠ্লেন। বল্লেন—"নাঃ! যত সব হা ঘরে ব্যাটাদের জ্বালায় দেশে আর বাস করা গেল না! যে ব্যাটা আসে, সেই বলে 'দাও চাকরী'।"

তারপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে আবার বল্লেন,—"কি হে ছোকরা! জল তোলা আর বাসন মাজার কাজ করতে পারবে? এই জন পঞ্চাশের কাজ। প্রথম ছ'মাস মাইনে পাবে না কিন্তু—তা ব'লে দিচ্ছি। আর, এই দেশেরই কোন লোককে জামিন রাখতে হবে। পারবে?"

বুঝলাম, ওর কাছে চাকরীর আশা করা বৃথা। কাজ যেমনই হোক্, তায় আবার জামিন চাই। কাজেই নমস্কার করে চলে এলুম।

এর পর তিন-চার দিন নানা জায়গায় চেষ্টা করতেই কেটে গেল।

হরিবাবুর টাকাটি আছে তাই রক্ষে। দু' চার পয়সা করে খাই আর রাতে যেখানে হোক এক জায়গায় পড়ে থাকি। সারাদিন কাটে কেবল চাকরীর সন্ধান করতে করতে। শেষে একদিন একটা সামান্য গোছের চাকরী যোগাড় হয়ে গেল।

একটি কায়স্থ ঘরের মেয়ে বাপের বাড়ী এসেছিলেন বেড়াতে। তাঁর কোলে একটি খোকা। তিনি আমাকে তাঁর শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যেতে চান। ছেলে ধরা আর দোকান-বাজার করা—এই শুধু কাজ। তারপর বিশ্বাসী হয়ে থাকলে. তাঁর জমিদার শ্বশুরকে বলে আমার অনেক কিছু ভাল করে দেবেন। মাইনে, খোরপোষ আর দুটো টাকা।

অন্য আশা আর নেই। কাজেই তাতে রাজী হয়ে গেলাম এবং পরদিনই তাঁর সঙ্গে আরো দশক্রোশ দূরে রাধানগরে চল্লাম চাকরী করতে। রায়পুরের পাশেই নদী। নৌকো চড়ে আমরা চল্লাম রাধানগরে।

বারো

রাধানগরে এসে বুঝতে পারলাম যে, বড়লোকগুলি যেন আর এক ভগবানের সৃষ্টি। তাদের জীবনের আড়ম্বর খুব, কিন্তু তার মধ্যে হৃদয় নেই। স্বার্থপরতা তাদের শিরায়-শিরায়, অস্থিতে-অস্থিতে মজ্জাগত। নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা তারা এত বেশী

বোঝে যে, তার জন্যে তারা গরীবদের রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ বলে স্বীকার করতেই চায় না।

মনে একটা প্রশ্ন হ'ল, বড়লোকগুলি কি গরীবদের শত্রু হ'য়ে জন্মে আছে? যে ক'টি বড়লোকের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাদের সবাই দেখ্‌ছি ঠিক ঐরূপ।

যে মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী চাকরী করতে এসেছি, তাঁরা খুব বড়লোক —জমিদার। আমার মত আরো পাঁচ-ছয়টি চাকর তাঁদের রয়েছে। আমাকে তাদের দলে ভর্ত্তি হ'তে দেখে অবধি তারা ঠারে-ঠোরে আমাকে কত কি যেন বলতে চেষ্টা করতো। কিন্তু আমি তাদের কোন কথাই বোঝবার চেষ্টা করিনি।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম যে, সে-বাড়ীতে কাজ করা দুঃসাধ্য। বাড়ীর ছোট খোকাটি থেকে বুড়ো কর্ত্তা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এক একজন মস্ত মনিব। তাদের নানা জনের নানা হুকুম তামিল করা মানুষের সাধ্য নয়। আবার হুকুম পালনে এক মিনিট বিলম্ব কি ক্রটী হলেই আর রক্ষে নেই। হাতে মাথা কাটবার জন্যে তখনি বিশটা হাত 'রে রে রে' করে তেড়ে আসবে।

এদিকে কিন্তু চাকরদের খাওয়ার দিকে দৃষ্টি করবার মত লোক একজনও নেই। দুপুরের ভাত খেতে চারটে বেজে যায়—তাও যা খাবার, সে বুঝি কুকুরেরও অখাদ্য। ভোর বেলা কোন জলখাবারের নাম-গন্ধও নাই। তা ছাড়া, কথায় কথায় প্রহার আর ভাতবন্ধ, এ যেন প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

বাবুদের আর বাড়ীর মেয়েদের কিন্তু সারাদিনই ভোজ লেগে আছে। তাঁদের যেমন রকমারী খাওয়ার ঘটা, তেম্নি রকমারী

খেয়াল। তাঁদের পিছনে ছুটোছুটি করতে করতে এক ঘটী জল খাওয়ারও সময় পাওয়া যায় না।

পনেরো দিন কাজ করলাম, তার মধ্যে পাঁচদিন ভাতবন্ধ। কানমলা, চড়-চাপড় তো আছেই। দু'দিন কর্ত্তাবাবুর কাছে বেতও খেলাম বিলক্ষণ। অপবাধ, একদিন ধোয়া জাজিমের ওপর কালির দোয়াত উল্টে দেওযা, আর একদিন একটা কলকে ভাঙা। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, একটা লোকও তার জন্যে একটু 'আহা উহু' করলে না!

চাকরীর সখ্‌ মিটে গেল, এখন পালাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু হাতে আর কিছু নেই। হরিবাবুর টাকার যে কয় আনা অবশেষ ছিল, তা বাবুদের বাজারে গচ্ছা দিতেই শেষ হয়েছে। ভাবলাম, পনেরো দিনের মাইনেটা যদি পাই, তাহলেও একটা টাকা হবে। তাই নিয়ে যেখানে হয সরে পড়বো। তারপর যা আছে কপালে।

কিন্তু চাকরদেরই কাছে জানলাম যে, এ বাড়ীতে মাইনে দেওয়ার রেওয়াজ নেই। তারা কেউ এক বছর, কেউ দু বছর কাজ করছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি পয়সা মাইনে ব'লে পায়নি। মাইনে চাইলেই চোর বদনাম নিয়ে পুলিসের গুঁতো খেতে হবে। দু-একজনের সেই দশাই হয়েছে।

কি সর্ব্বনাশ! এর নাম জমিদারের বাড়ী চাকরী? এর নাম বড়লোকের অন্ন? এখান থেকে পালাতে পারলে যে বাঁচি! কিন্তু পালাতে গেলেও লুকিয়ে পালাতে হবে। নইলে বাবুরা জানতে পারলে তখনি হয়তো কোন ফ্যাসাদে পড়ে যাব।

যাই যাই করে আরো ক'টা দিন কাটলো। সুযোগ আর আসে না। ইতিমধ্যে আরো অনেক কিছু দেখতে ও জানতে পেলাম। জমিদার যে কি ভয়ানক জীব, তা জেনে আমার সারা দেহ আর মন বিষের জ্বালায় জ্বলে যেতে লাগলো।

ভাবলাম, সব জমিদারই কি এইরকম? তখনই সঙ্কল্প করলুম, "হে ভগবান! যদি কখনো সুযোগ পাই তবে এইরকম বড়লোকদের যেন সর্ব্বনাশ করতে পারি। আমার জীবনের প্রধান সাধনাই যেন হয় অত্যাচারী বড়লোকদের সর্ব্বনাশ-সাধন।"

তখন খাজনা আদায়ের ভরা মরশুম। লাটের কিস্তি মেটাবার জন্যে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, পাইক, পেয়াদা সকলে পাগ্‌লা কুকুরের মত গরীব প্রজাদের ওপর হানা দিতে সুরু করেছে। খাতির নেই, কৈফিয়ৎ নেই, বিচার-বিবেচনা করবারও কিছু নেই। টাকা দাও—টাকা! টাকা! ধান হয়নি, পাট হয়নি অজন্মা, অনাহার, রোগ, শোক, মৃত্যু—ওসব অছিলা চালের মট্‌কায় তুলে রাখো। আগে টাকা বের করো, তারপর ওসব কথা! গরীব প্রজারা দুচোখে অন্ধকার দেখতে লাগ্‌লো।

বাবুরা একেবারে রুদ্র মূর্ত্তি ধ'রে বসেছেন। প্রজাদের কান্না-কাটি, অনুনয়-বিনয় কিছুতেই তাঁরা কান দিতে নারাজ। লাটের কিস্তির বেলা দয়ামায়া দেখাতে গেলে কি চলে? টাকা দাও—নইলে যে উপায়ে হোক, তা আদায় করে নেওয়া হবে।

এতদিন যা কিছু আদায় হয়েছে, তা সব বাবুয়ানী, সখ-সৌখিনতা, আর বদ্‌খেয়ালের পিছনেই গেছে। এখন প্রজার বুকের রক্ত শোষণ করে জমিদারী রক্ষা করা চাই। তাতে প্রজা

মরুক বা বাঁচুক, তা দেখবার ভার সেই জমিদারের নয়। তাই টাকা সংগ্রহের জন্য গরীব প্রজাদের ওপর জুলুম, অত্যাচার, অবিচার আর নির্ম্মমতার চরম অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল।

, নিত্য দেখি, পাইকরা জমিদার বাবুর কাছে দলে দলে গরীব প্রজাদের ধরে আনছে। তাদের কি সাজা! কি দুর্গতি! কি কষ্টভোগ! কাউকে সারাদিন প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটবার উপক্রম করলেও হাজার অনুনয় সত্ত্বেও এক ঢোক জল তাকে দেবার হুকুম নেই। কাউকে বা জল-বিছুটী লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে—সে পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে লাফালাফি সুরু করে দিয়েছে। আবার কারও ভাগ্যে নির্ম্মম বেত্রাঘাত। বেচারার সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

এদিকে প্রজাদের গোলা শূন্য করে, তাদের খোরাকী ধান গাড়ী বোঝাই করে আনা হচ্ছে। তারা হয়তো অন্নের অভাবে অনাহারেই মারা যাবে। কিন্তু সে বিবেচনা করবে কে? খাজনা দাও, নইলে এই ধান বেচে যতদূর সম্ভব তা আদায় করা হবে।

প্রজাদের গাই, বাছুর, চাষের বলদ, ছাগল, ভেড়া—সব ধরে এনে জমিদারের খোঁয়াড়ে ভর্ত্তি করা হচ্ছে। টাকা দাও, তবে এসব খালাস করে দেওয়া হবে। নইলে এসব নীলাম করে আদায় করা হবে জমিদারের খাজনার টাকা।

পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল, জোর-জবরদস্তির সঙ্গে উঠিয়ে আনা হচ্ছে। তার বেশীর ভাগই হয়ে যাচ্ছে লুট। অবশেষে যা থাকে, তা জমিদারের খরচের দাবীতেই শেষ হয়ে যায়। প্রজার দেনার এক কণাও তাতে শোধ হয় না।

চক্ষের উপর এই সব রোজই দেখি, আর গায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে মরি। ওঃ! এর নাম জমিদারী? এমন নিষ্ঠুর লোককে বলে জমিদার? আর তিনিই হচ্ছেন আমার মনিব?

জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। চৌদ্দ বছর বয়সেই মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যেটুকু লাভ হয়েছে, তাতে মনটা তিক্ত হয়ে উঠেছে খুবই। এর আগে আমার মন বড়লোকদের বিরুদ্ধে কখনো এতটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি। এখন এই সব পৈশাচিক আচরণ স্বচক্ষে দেখে আমার প্রাণের ভিতরে যেন একটা রাক্ষসের প্রতিহিংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো!

মনে মনে ভগবান্‌কে ডেকে বলতে লাগলাম—"শক্তি দাও ভগবান্! শক্তি দাও! সুখ চাই না, বিলাস চাই না,—মানসম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য কিছুতেই আমার দরকার নেই। শুধু আমাকে শক্তি দাও, যেন তারই সাহায্যে গরীবের মহাশত্রু এই রকম বড়লোকদের আমি ধ্বংস করতে পারি।"

যাক্। এর পরই একটা সুযোগ এসে গেল। নদীর পরপারে বনকালীর মন্দির। সেখানে পূজো পাঠাতে হবে। চাকরদের মধ্যে আমি ছেলে মানুষ—তায় ব্রাহ্মণ। আমাকে নদী পার হয়ে সেখানে পূজো দিয়ে আসবার হুকুম হ'য়ে গেল।

একটা তামার থালায় কিছু ফল-মূল, ফুল-বিল্বপত্রাদি নিয়ে চল্লাম সেখানে পূজো দিতে।

পূজো ঠিক পৌঁছে দিলুম বটে, কিন্তু আমি আর ফিরলাম না। শুধু হাতে, নিঃসম্বল অবস্থায় মাঠের পথ ধ'রে আবার সেই ক্রোশের পর ক্রোশ ভেঙ্গে চল্লাম—কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্টের অভিমুখে।

তেরো

চল্লাম বটে, কিন্তু সে চলার শেষ আর মেলে না। সেদিকে মাঠের পর মাঠ, তার পরে মাঠ। মাঝে মাঝে এক একটা বিল, জলা বা জঙ্গল। চাষের ক্ষেত বড় একটা চোখে পড়ে না। মাঠে কেবল খড় আর কাঁটা-গাছের রাজ্য। না জেনে শুনে এমন পথে পা দিয়েছি মনে করে বুকটা বড়ই দমে গেল। তবু যথাসম্ভব জোরে জোরে পা চালাতে লাগলাম—কেবল আশায় ভর করে।

ক্রমে দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। শেষে একটা জলায় নেমে অাঁজলা করে জল খেয়ে নিলাম। তারপর আবার চলতে লাগলাম, কোন একটা লোকালয় পাবার আশায়।

শেষে একটা নানা রকম গাছঘেরা গ্রাম চোখে পড়লো। কিন্তু সেটা অনেক দূরে—বোধ হয় তখনও দু'ক্রোশ। দ্বিগুণ উৎসাহে সেই দিকেই পা চালিয়ে দিলাম।

কিন্তু অল্পদূর যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, আমার শরীর যেন কেমন কেমন হ'য়ে আসছে! মাথা বেজায় ভার, সেই সঙ্গে বমির একটা তীব্র ভাব। এক মুহূর্ত্তে মহা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বুঝলাম,—জলার পচা জল খেয়েই আমার এমন দশা উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু উপায় নেই—চলতেই হবে। নইলে সেই তেপান্তর-মাঠের মধ্যেই মরণ অনিবার্য্য। পারি না, পারি না, করেও তাই প্রাণপণে ছুটে চল্লাম সেই গ্রামটির দিকে।

গ্রামের সীমা পেলাম ঠিক সন্ধ্যায়। প্রথমেই একটা নদীর বাঁক। আমার ডান দিক থেকে এসে ঠিক সেইখানটিতে নদীটা বেঁকে গিয়েছে। নদীর ধারে একসঙ্গে দুটো তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। তার বশি দুই তফাতেই দেখা যাচ্ছে লোকালয়। ভাবলাম প্রথমেই যে বাড়ী পাবো, সেখানেই আশ্রয় নিতে হবে।

কিন্তু তালগাছের কাছে আসতেই হঠাৎ সুরু হলো বমি। সঙ্গে সঙ্গে কি ভয়ানক কাঁপুনি। সাধ্য কি যে আর এক পাও এগোই! দাঁতের উপর দাঁত যেন চেপে বসতে লাগ্‌লো! দম আর ফেল্‌তে পারি না। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে সেইখানেই মুখ থুবড়ে পড়লাম্‌। তারপর কখন যে চৈতন্য লোপ পেয়ে গেল, তা বলতে পারি না।

সারা রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল, জানি না। সকালেও সেই অবস্থা। একবার শুধু ক্ষণিকের জন্য বোধ হ'লো কে যেন আমায় কি বলছে! কিন্তু পরক্ষণেই আবার বেহুঁস হয়ে পড়লাম।

এরপর যখন আবার জ্ঞান হ'লো, তখন বুঝলাম যে আমি একটা বিছানার উপরে শুয়ে আছি। আমার শরীরে আর কিছুই নেই। অতি কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমার মাথার কাছে একজন দেবীরূপিণী বিধবা বসে আছেন। তাঁর চোখ দুটিতে কি অসীম করুণার ভাব মাখা! তাঁর মুখখানিতে কি অগাধ মমতা আর সান্ত্বনার অভিব্যক্তি!

বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

ইনিই আমার মা—তোমার স্ত্রী অনিতার জননী। মানুষীর ছদ্মবেশে স্বর্গের দেবী যে পৃথিবীতে বাস করেন, জীবনে তা আমি

সেইদিনই প্রথম জানলাম। তারপর তাঁরই স্নেহে আর তাঁরই দয়ায় অনেকদিন পরে আমি যেন নূতন ভাবে নূতন জীবনে জেগে উঠ্‌লাম।

নূতন জীবনই বটে। এর সঙ্গে আমার সেই চির দুঃখ-কষ্টসঙ্কুল অতীত জীবনের কোথাও এতটুকু মিল নেই। সেই স্নেহ দয়া মায়া ইত্যাদি হতে চির বঞ্চিত, সেই অবিচার অত্যাচার আর অযথা উৎপীড়নের দ্বারা চির-উৎপীড়িত, সেই অশেষ দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট আমি যেন সেই নদীতীরের তালগাছের তলায় ম'রে একটা অভিনব মায়ার রাজ্যে এসে জন্মগ্রহণ করেছি! সেখানে মায়ের অফুরন্ত স্নেহের সঞ্জীবনী-শক্তিতে জড় পাষাণেও জেগে ওঠে প্রাণের স্পন্দন, অমাবস্যার জমাট অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলে ওঠে পৌর্ণমাসীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, নরকের তীব্র দহনজ্বালার উপরে নিজে নিজেই এসে পড়ে অমৃতের প্রলেপ। কি পুণ্যফলে আমি যে এমন মায়ের স্নেহাশ্রয়ে এসে পড়েছিলাম, তা আজও আমি ভেবে ঠিক করতে পারি না।

রোগ থেকে মুক্ত পেলাম, পূর্ব্বস্বাস্থ্যও ফিরে এল, কিন্তু আমি সেখানে মায়ের কাছে একেবারেই বাঁধা পড়ে গেলাম। মায়ের একটি মাত্র মেয়ে অনিতা তখন দু'বছরের শিশু। আমিই হলাম মায়ের বড় ছেলে, মায়ের অতি আদরের পালিত সন্তান।

আদর যে এত মিষ্টি, স্নেহ যে এত কোমল, মায়া যে এমন মনোহর, এর আগে কোনদিন তার একটুও জানতে পারিনি। জানলাম এই চৌদ্দ বছর বয়সে, এই সাক্ষাৎ ভগবতীর মত মা আর ননীর পুতুলের মত বোন পেয়ে। হায় রে! স্বর্গের এমন আশীর্ব্বাদ,

—পৃথিবীতে থাকতেও যারা অপরকে তা থেকে বঞ্চিত করে রাখে, তাদের মত মহাপাপী কি আর ব্রহ্মাণ্ডে আছে ?

বড় সুখে, বড় আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম। মায়ের কাছে আমার আত্মকথা সবিস্তারে সবই বলেছিলাম। সেই সঙ্গে বলেছিলাম আমার জীবনের প্রধান সঙ্কল্পের কথা।

মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার, গরীবের প্রতি বড়লোকের প্রাণহীন নির্মম ব্যবহার, বাংলার দিকে দিকে যে হাহাকারের সৃষ্টি করে তুলেছে, আমি যে তারই প্রতিহিংসা নিতে কৃতসঙ্কল্প, সে কথা মায়ের চরণে বেশ প্রাণ খুলেই নিবেদন করেছিলাম।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মা আমার মাথাটা তাঁর কোলের উপর সস্নেহে টেনে নিয়ে গদ্‌গদ স্বরে উত্তর করেছিলেন ঃ

"বাছারে! এতটুকু বয়সে যে পাহাড়-প্রমাণ দুঃখ তুই পেয়েছিস, আমার সমস্ত বুকটা দিয়েও আমি তা মেপে উঠতে পারছি না। তোর যে এমন কঠোর সঙ্কল্প হবে, এ তো স্বাভাবিক। আমার বোধ হয়, এ বুঝি ভগবানেরই খেলা! তিনি যে তোকে তোর জন্ম হতেই এতটা নির্য্যাতন সইতে দিয়েছেন, সে শুধু তাঁরই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। দরিদ্রনারায়ণের দুঃখে নারায়ণের আসন টলেছে নিশ্চয়। তাই হয় তো তোকে দিয়েই তিনি এর প্রতিকার করতে চান। নইলে এই কচি বয়সে, এই দারুণ প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তোর হবে কেন ? যাক্—তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হবে—কেই বা তা রোধ করবে বল্ ? তবে যাই করিস, দেখিস বাবা! যেন নিজের জন্যে পরের অনিষ্ট করতে যাস্ না। নিঃস্বার্থভাবে যা করা যায়, সেইটিই কাজ,—তাতে পাপ নেই! কিন্তু স্বার্থের গন্ধ থাকলেই

সেটা পাপকাজ—ভগবানের দয়া তাতে পাবি না। এইটুকু সর্ব্বদাই বুঝে চলিস্। এর বেশী তোকে আমার বলবার কিছু নেই।”

মায়ের সে উপদেশ আমার ভবিষ্যৎ দস্যু-জীবনে যে কি প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, তা আমি বলে শেষ করতে পারি না। প্রতি-হিংসার তাড়নায় আর সঙ্কল্পের খাতিরে অত্যাচারী ধনী মহাজনদের সর্ব্বস্ব লুট করে তাদের মধ্যে অনেককেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে এসেছি; কিন্তু একদিনের জন্যেও আমার মনে হয়নি যে, আমি কোন পাপ করেছি। যা কিছু আমি করেছি, তাতে প্রেরণা জুগিয়েছে শত-সহস্র নিগৃহীত দরিদ্রনারায়ণের কাতর আবেদন, আর তাতে উপকৃত হয়েছে তারাই।

যাক্। সে সব পরের কথা। এমন অশেষ করুণাময়ী জননীর কোলে আশ্রয় পাবার পরে, আবার কেমন করে আমি এমন দুর্দ্দান্ত দস্যু হয়ে উঠলাম, সেই কথাই আগে তোমাকে সংক্ষেপে বলছি, শোনো ঃ

মায়ের কাছে খুব যত্নের সঙ্গেই আমি প্রতিপালিত হতে লাগলাম। একদিকে যেমন প্রচুর ভোগ, অন্যদিকে তেম্নি নানা-রকম স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা! কুস্তি, ব্যায়াম, লাঠি, সড়কীখেলা, ঘোড়দৌড়, সাঁতার—সব তাতেই হয়ে উঠলাম অসাধারণ দক্ষ। দু'বৎসর পরে আমার ওস্তাদেরা আর আমার সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। পাণ্ডবগুরু দ্রোণাচার্য্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা পেয়ে মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন যেমন তাঁরই আশীর্ব্বাদে তাঁকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, আমিও তেম্নি আমার ওস্তাদদের ডিঙ্গিয়ে তাঁদের অনেক উপরে

উঠে গেলাম। গায়ের জোর আর অস্ত্রচালনায় আমার সমকক্ষ বলতে কেউ আর রইলো না।

আমার মায়ের অবস্থা পূর্ব্বে খুবই ভাল ছিল। তাঁর স্বামী ছিলেন ওই অঞ্চলের পুরুষানুক্রমে বিশিষ্ট একজন জমিদার। কিন্তু তাঁরই একজন দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি গোবিন্দলাল নানা কৌশল, ছলনা আর জাল জুয়াচুরি করে জমিদারীর প্রায় চৌদ্দ আনা অংশ ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল। তিনি এ ব্যথা সহ্য করতে পারেননি। তাই অনিতার জন্মের ঠিক পরেই অকস্মাৎ হার্টফেল হয়ে তিনি মারা গিয়েছিলেন।

গোবিন্দলালের অত্যাচার কিন্তু চলছিল ঠিক সমান ভাবে। সে জন্যে আমার মাকে খুব সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে বাস করতে হতো। কিন্তু আমি সেই রকম বলবান আর খেলোয়াড় হয়ে ওঠার পর হতে সে ভয় তাঁর আর রইলো না।

মায়ের উপর কোন অত্যাচার করতে সে সাহসী হল না বটে, কিন্তু গরীব প্রজাদের উপর হতে লাগ্‌লো অকথ্য অত্যাচার। ইতিপূর্ব্বে চিরদিন তারা মায়েরই প্রজা ছিল। ইদানীং গোবিন্দলালই হয়ে উঠেছে প্রায় সবটুকু জমিদারীর মালিক। মায়ের যেটুকু সামান্য অংশ অবশেষ আছে, তাও সে গায়ের জোরে দখল করতে চায়। প্রজারা কিন্তু বেইমানী করতে চায় না। এই জন্যেই তাদের উপর নানারকম জুলুম চলতে লাগ্‌লো।

রাধানগরে যে পশুত্বের অভিনয় দেখে এসেছি, এখানেও প্রায় তাই। প্রজারা দলে দলে মায়ের কাছে এসে কাঁদতে থাকে। কিন্তু মা আমার নিরুপায়। কি প্রতিকার তিনি

করবেন ? তিনিও তাই তাদের দুঃখে তাদের সঙ্গেই কাঁদতে বসে যান।

আমার দেহে আগুন জ্বলতে থাকে। মায়ের চোখে জল দেখে আমার আর কোন নীতি, কোন আইন মানবার প্রবৃত্তি থাকে না। মনে হয় তখনই বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে পড়ি, গোবিন্দলাল আর তার সাহায্যকারীদের সবংশে ধ্বংস করে আমার মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিই ; মায়ের প্রজারাও সেই সঙ্গেই পেয়ে যাক্ নিষ্কৃতি।

কিন্তু সে কাজে বাধা পাই মায়ের মৃদু ভর্ৎসনায় আর অনিতার কান্নাতে। আমাকে রাগতে দেখলেই সে কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়, আর প্রাণপণে আমার গলা আঁকড়ে ধরে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে। বাধ্য হয়ে মনের আগুন মনে চেপে, নানা উপায়ে তাকে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠি।

কিন্তু মন আর কিছুতেই মানতে চায় না। শৈশব থেকে যে তুষের আগুন চিরদিন বুকের মধ্যে ধিকি-ধিকি জ্বলছে, সে আর কিছুতেই চাপা থাকতে রাজী নয়। সে চায় এইবার দাবানলের মত জ্বলে উঠে এক নিমেষে সারা দেশটা ছারখার করে দিতে। মনে হ'ল—মানুষ হয়ে জন্মে, মানুষের প্রতি পশুর অত্যাচার যদি দমন করতে না পারি, তবে কিসের জীবন ? কেন তবে এত উৎপীড়ন স'য়ে বেঁচে থাকা ? মায়ের চোখের জল, আর ভায়েদের করুণ আর্তনাদই যদি দেখতে বা শুনতে হয়, তবে নিজের ভোগবিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মত্ত থাকার চেয়ে পশুত্বের নিদর্শন আর কি থাকতে পারে ?

ভিখারী কি বেদমন্ত্রই আমার কানে ঢেলে দিয়েছিল। তার প্রতিটি শব্দ তখনো আমার বুকের মধ্যে গাঁথা ছিল! সে বলেছিল —"আমি মানি আর আমি বিশ্বাস করি যে এই পৃথিবীতে যারা হতভাগ্য, যারা দীনহীন, তারা সকলেই আমার ভাই—আমার আপনার লোক। কিন্তু ভদ্রলোক বা বড়লোকেরা আমাদের শত্রু।"

সেই গরাব ভাইদের প্রতি নৃশংস জমিদার ও বড়লোকদের এত অত্যাচার! এর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই আর মনকে শান্ত রাখতে পারি না।

কিন্তু কি উপায়? কোথায় সেই প্রতিশোধের পথ? ভেবে আর কিছু ঠিক করতে পারি না। যত দিন যায়, মন ততই অধীর হ'য়ে ওঠে। নিত্য-নতুন অত্যাচারের সংবাদ আমার জ্বলন্ত হিংসার আগুনে আরও যেন ইন্ধন যোগাতে থাকে।

মায়ের কাছে আদরে, যত্নে, ভোগে, বিলাসে দিন কাটে, কিন্তু তবু মনের অধীরতা ক্রমেই যেন বেড়ে ওঠে। আমি যথাসাধ্য গোপন করে চলি, কিন্তু মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে যায়। মা আমাকে কত উপদেশ দেন, কত বোঝান; কিন্তু সে সব কথায় নূতনত্ব কিছুই খুঁজে পাই না। আমারও প্রাণ তাই তাতে সান্ত্বনা মানে না।

তখন কুড়ি বৎসরে পা দিয়েছি। এই বয়সেই আমি একজন মস্ত পালোয়ান। বাল্যের সেই ভীরু, গুজ্‌গুজে দুর্ব্বল ছেলের পরিবর্ত্তে এখন আমি যেমন বলবান, তেম্নি দুঃসাহসী। মায়ের আশীর্ব্বাদে আমার সেই গোজন্ম ঘুচে গিয়ে, আমি যেন এখন একটা দস্তুরমত মানুষ হ'য়ে উঠেছি!

এমনি সময়ে আমাদের গ্রামের পাশে নদীর তীরে সেই জোড়া তালগাছের তলায় একজন সাধু এসে আড্ডা গাড়লেন। সাধুর বেশ-ভূষায় ভণ্ডামীর বাহুল্য নেই। তাঁর না আছে দীর্ঘ জটা, না আছে কোঁটা-তিলক-চন্দনের ঘটা, না আছে গাঁজা টানার ধুম। গৈরিক বসন আব গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা—এই ছিল তাঁর সাধুত্বের একমাত্র নিদর্শন। হাতদেখা, ভাগ্যগণনা, বা কবচ-মাদুলী দান একেবারেই ছিল না। কাজে কাজেই প্রথম হ'তে তাঁর প্রতি অনেকেরই কেমন একটা শ্রদ্ধা এসে গেল।

সাধুর কোন অহঙ্কার নেই। যে যায়, তার সঙ্গেই তিনি হেসে কথা বলেন। কৌতূহলী হ'য়ে আমিও একদিন গেলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সেই দিনই বুঝলাম, সাধু এক অপূর্ব্ব ধরণের লোক। সাধু হলেও ধর্ম্মের কোন গোঁড়ামী তাঁর ভিতরে নেই। দেব-দেবী পূজা বা লৌকিক ধর্ম্মাচারকে তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম বলে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "ওগুলি সব ভণ্ডামী।" তাঁর মতে ভগবান বা ঈশ্বর একটা স্বতন্ত্র সত্তা নয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ভগবান্। পৃথিবীর জীব জন্তু মানুষ প্রভৃতিকে অবহেলা বা ঘৃণা করে, মাটি বা পাথর দিয়ে ভগবানের মূর্ত্তি গড়ে পূজো করলেই ভগবানের পূজো করা হয় না। সর্ব্ব জীবের সেবা আর বিশেষ করে মানুষের উপকার করলেই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ করা হয়—কারণ, মানুষই ভগবানের স্বরূপ।

অবাক হয়ে গেলাম। সাধুর উপর প্রগাঢ় ভক্তি এসে গেল। সেই থেকে প্রতিদিনই তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম।

আমার নিজের জীবনের আত্মন্ত ইতিহাস ও আমার সঙ্কল্পের কথা সবই তাঁর কাছে প্রকাশ করলুম। তিনি কেবল একটু হাসলেন।

খানিক চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন—“বেটা! আজও তুই বুঝতে পারলি না যে, ভগবান তোরই বুকের মধ্যে রয়েছেন? তিনিই তোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্‌গুলো পাপ আর কোন্‌গুলো ধর্ম্ম। আর যে সঙ্কল্পের কথা তুই বলছিস্‌, ওটা তোর বাহাদুরী নয়—ওটা হচ্ছে তাঁরই নির্দ্দেশ। তিনি চান একের ভিতরে তাঁর দণ্ডশক্তি জাগিয়ে তুলে অপর দশজনের মহাপাপের দণ্ড দিতে। তাঁর তো আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাই মানুষকে দিয়েই তিনি তাঁর কাজ করিয়ে নেন।

মহাভারতের কথা ভেবে গ্যাখ্‌। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান্‌। তিনি কি ইচ্ছে করলে একদিনেই পৃথিবীর ভার হরণ করতে পারতেন না? তবে কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে তিনি পাপী আর পুণ্যাত্মা দুই দলেরই মৃত্যু ঘটালেন কেন? কাজ ভগবানের, কিন্তু করে মানুষে—কারণ মানুষই তাঁর পূর্ণ স্বরূপ।”

সাধুর কথায় কি উৎসাহ যে প্রাণে এসে গেল, তা আর বলতে পারি না। আমি তখন তাঁর পা জড়িয়ে বল্লাম:

“আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি একজন মহাপুরুষ। দয়া করে আপনি আমায় শিষ্য করে নিন, আর আমায় বলে দিন যে,—এখন আমি কি করবো? মানুষের ওপর মানুষের অন্যায় অত্যাচার দেখে দেখে আমার মনের ভিতরটা পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। আমি অতি সামান্য লোক—তবু আমার মনে এর প্রতিহিংসার বাসনা জেগে উঠলো কেন, তা আমি বুঝতে পারতাম না। এখন জানলাম সেটা

ভগবানের নির্দ্দেশ। তবে বলুন, কি করলে আমি তাঁর আদেশ পালন করতে পারবো ?”

সাধু আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। বল্লেন—“বেটা ! তোকে উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্য নয়। তোর ভিতরে যে অগ্নি-মন্ত্রের বীজ রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোলা আমার কাজ নয়। আমার গুরুদেব অগ্নিমন্ত্রের সিদ্ধ-সাধক। তিনিই কেবল তোকে পথ দেখাতে সমর্থ। যাবি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ? কিন্তু যেতে হবে গোপনে। আর, হয়তো একবার গেলে আর সহজে ফিরতেও পারবি না।—পারবি যেতে ?”

দৃঢস্বরে বল্লাম—“হ্যাঁ, পারবো। যদি মনের মত পথ খুঁজে পাই তো ফিরে আসবার চেষ্টা করবো না—আসতে চাই না। এখন বলুন, দয়া করে আমায় সেই মহাপুরুষের কাছে নিয়ে যাবেন ত ?”

সাধু সম্মত হলেন। যাত্রা সম্বন্ধে পরামর্শ শেষ করে আমি মায়ের কাছে ফিরে এলাম। দুদিন আর কোথাও গেলাম না। অনিতাকে কত রকম আদর-যত্ন করতে লাগলাম। মায়ের জন্যে ভারী কষ্ট হতে লাগল, তবু মনের অসাধারণ শক্তিতে তা দমন করে রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আভাসও মাকে জানতে দিলাম না।

তৃতীয় দিনের গভীর রাত্রে সাধুর সঙ্গে সেই মহাপুরুষের দর্শন আশায় আবার সেই অনির্দ্দিষ্টের পথে যাত্রা করলাম।

চৌদ্দ

তেজশঙ্কর আবার একটু বিশ্রাম ক'রে নিলে। তারপর আবার সুরু করলে :

"এইবার খুব সংক্ষেপেই আমার জীবনী শেষ ক'রবো—কারণ সত্য গোপন না ক'রলেও এমন কথা আমি তোমাকে জানাতে পারি না, যাতে পরের অনিষ্ট হওয়া সুনিশ্চিত। আমি শুধু আমার পরবর্ত্তী জীবনের মোটামুটি আভাস তোমাকে দিয়ে যাবো।

সাধুর সঙ্গে হাজির হলাম বহু দূরবর্ত্তী একটা পাহাড়ে।

সেখানে একটা দেবালয়কে কেন্দ্র ক'রে কয়েক জন সাধু-সন্ন্যাসীর একটা আশ্রম আছে। সাধুদের সঙ্গে কয়েকদিন আমাকে সেই আশ্রমেই কাটাতে হ'লো।

আশ্রমের যিনি প্রধান সাধু, তিনি একে একে আমার সব কথাই জেনে নিলেন। তারপর আরম্ভ হ'লো পরীক্ষা। সে যে কি ব্যাপার, তা আর তোমাকে কি বলবো? মোটের উপর কিছুদিন পরে জানতে পারলাম যে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। তখন সেই মহাপুরুষের কাছে অগ্নিমন্ত্রে আমার হ'লো দীক্ষা।

দীক্ষার কথা তোমাকে বলেই বা ফল কি? তবে জেনে রাখো যে, সেইদিন থেকে আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যই হ'লো দেশের দরিদ্রনারায়ণের দুঃখ দূরীকরণ। নিজের ভোগ-বিলাস, ঐশ্বর্য্য, সুখ-শান্তি সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল দরিদ্র ও দুর্ব্বলদের সকল দায় থেকে যথাসাধ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সেই আশ্রমের নির্দ্দেশ ও আদেশ

মত আমাকে যে কোন কাজ অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। তাতে ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, উচিত-অনুচিত—কোন বিচারই আমি করতে পারবো না।

আমার চিরদিনের সঙ্কল্পও ছিল তাই। সুতরাং এই অগ্নিমন্ত্রকেই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা বলে আমি সগর্ব্বে আঁকড়ে ধরলাম।

মন্ত্রের সাধনায় তার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম কর্ম্মক্ষেত্রে। বাংলা ও বিহারের যে যে স্থানে এই আশ্রমের গুপ্ত শাখা-প্রশাখা ছিল, আর যে যে দেশে বা সহরে অগ্নিমন্ত্রের গুপ্ত সাধক বাস করতো, তারা অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাকেই তাদের নেতা বলে স্বীকার ক'রে নিলে। ফলে সেই মহাপুরুষের কৃপায় আমিই হলাম তাঁর অগ্নিমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক—আমিই হলাম তাঁর প্রধান কর্ম্মী।

আশ্রমের নিয়ম অনুসারে আমার প্রকৃত নাম গোপন রেখে মহাপুরুষ প্রদত্ত তেজশঙ্কর নামেই আমি অল্পদিনের মধ্যেই দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হ'য়ে পড়লাম।

ইতিপূর্ব্বে অগ্নিমন্ত্রীদের সংখ্যা হয়েছিল বিস্তর। নানা দেশে, নানা কাজে তারা আত্মগোপন ক'রে ফিরতো, কিন্তু উপযুক্ত নেতার অভাবে তাদের কাজ তেমন সুশৃঙ্খলভাবে চ'লতো না। আমাকে নেতারূপে পেতেই তাদের উৎসাহ দশ গুণ বেড়ে গেল। তারপর হ'তেই তেজশঙ্করের নামে দেশ-বিদেশের টনক নড়ে উঠতে সুরু করলে।

অগ্নিমন্ত্রের কর্ম্মীর বেশে সব প্রথমেই আত্মপ্রকাশ করলাম রাধানগরে। তখন লাটের কিস্তির মুখ। গরীব প্রজাদের রক্ত শোষণ

ক'রে জমিদারের খাজাঞ্চিখানা তখন ভরপুর' গভীর রাতে 'মার মার্' রব ক'রে জমিদারের বাড়ীতে গিয়ে পড়লাম।

আমি জানতাম যে তাদের বন্দুক, পিস্তল, তরোয়াল, সবই আছে —কিন্তু চালায় কে? গরীবদের ওপর যারা জুলুম করে, তারা কখনো বীর হ'তে পারে না।

পরিচয়ও পেলাম তারই। ঘা দিলে পাছে দস্যুরা আরও ক্ষেপে যায়, সেই ভয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়ে কেউ খাটের তলায়, কেউ পায়খানায়, কেউ বা খড়গাদার নীচে ঢুকে পড়লো। আমরা নগদ দশহাজার টাকা, আর বাড়ীর মেয়েদের সোনা, রূপো আর জহরতের গহনাতে আরও প্রায় দশহাজার নিয়ে বুক ফুলিয়ে চ'লে এলাম। বাধা কেউ দেয়নি বলে প্রথম যাত্রায় মানুষের রক্তপাত করতে হ'লো না।

তখন দারুণ দুর্ভিক্ষের রাজ্য। বন্যায় শত শত গ্রাম ডুবে যাওয়ার ফলে উত্তর আর পূর্ব্ববঙ্গে গরীব চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকার। দয়াল দাদার নাম ক'রে আশ্রম থেকে সাহায্য বিতরণ সুরু হ'য়ে গেল। নরখাদক রাক্ষসের বুকের রক্তে হ'লো কত মানব-শিশুর ক্ষুধা দূর।

তারপর একের পর একটা ক'রে বাংলার বহুস্থানে হানা দিতে সুরু করলাম। মায়ের আশ্রয়ে থাকবার কালে মায়েরই দয়ায় যে অটুট শক্তি আর তীর চালনা শিক্ষা করেছিলাম, তার বলে আমি হয়ে উঠেছিলাম এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু। আমার গতি রোধ করে, কিংবা অস্ত্র-চালনায় আমাকে পরাস্ত করে, এমন লোক বাংলাদেশে আমার নজরে পড়লো না। কাজেই সর্ব্বত্রই আমাদের জয় জয়কার। ধনীর ভাণ্ডার

শূন্য ক'রে এনে দীন-দুঃখীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতে লাগলাম। বিলানোর কাজটা অবশ্য আশ্রমের সাধুদের দ্বারাই হ'তে লাগলো। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শাখার মারফৎ দরিদ্রেরা তাদের একান্ত অসময়ে সাহায্য পেতে লাগলো।

ধনীদের উপর বাল্য হ'তেই আমি বীতশ্রদ্ধ। ধনবান্‌দের সর্ব্বনাশ-সাধন আমার জীবনের সঙ্কল্প বলেই গ্রহণ করেছিলাম। তাই এই দস্যুতার কাজে একটি দিনের জন্যেও আমার প্রাণে বিন্দুমাত্র অনুতাপ আসেনি। আমি বরং উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহের সঙ্গেই অগ্নিমন্ত্রের সাধনা ক'রে চলেছিলাম। কারণ, আমাদের লক্ষ্য ছিল কেবল সেই সব ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি, যারা তাদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করে থাকে শত শত দীন-দরিদ্র লোককে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত ক'রে ; কিংবা যারা তাদের ভাগ্যলব্ধ বিপুল সম্পদ্ কেবল নিজেদেরই ভোগ-বিলাসে ব্যয় ক'রে যায় ; কিন্তু দেশের শত শত নিরন্ন, বুভুক্ষিত হতভাগ্যের দিকে একটি দিনের জন্যও মানুষের প্রাণ নিয়ে ফিরে তাকায় না।

এরকম জুলুমের কাজে মাঝে মাঝে নরহত্যা যে হয় না, তা নয়। কিন্তু আমি যথাসাধ্য তা' এড়িয়ে চলতাম। আত্মরক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে আমি কখনো কারও প্রাণ নষ্ট করিনি। সঙ্গীদের উপরেও আমার সেই রকম কঠিন আদেশ দেওয়া ছিল। নারী-জাতির প্রতি অত্যাচার কিংবা বিনা প্রয়োজনে নরহত্যা—অগ্নিমন্ত্রের নীতি-বিরুদ্ধ।

কিন্তু তবুও দু'-চার ক্ষেত্রে ইচ্ছা ক'রেই আমি নিজের হাতে নৃশংসভাবে নরহত্যা করেছি। মহাদুর্ব্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যে দারুণ

প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি পূর্ব্ব হ'তেই আমার মনে পুঞ্জীভূত হ'য়ে ছিল, তার কঠিন প্রেরণা থেকে কিছুতেই আমি আমাকে মুক্ত করতে পারিনি। সেই সব হতভাগ্যদের জন্য দুঃখ হয়,—দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তারা মানুষ হ'য়েও মানুষের মত হয়নি; নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মানুষ বলে তারা ভাব্‌তে শেখেনি!

আমি প্রথম নরহত্যা করি খঞ্জনপুরে। দুর্ব্বৃত্ত গোবিন্দলাল বহুদিনের চেষ্টায় একদল গুণ্ডা সংগ্রহ ক'রে আমার মায়ের ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল আমার মা আর অনিতাকে খুন করিয়ে তার জমিদারী নিষ্কণ্টক করতে। কিন্তু আমি পূর্ব্ব হ'তেই তার বিরুদ্ধে চর নিযুক্ত ক'রে রেখেছিলাম—সে-সন্ধান সে রাখ্‌তো না। ফলে ডাকাতদের উপরেই হ'লো ডাকাতি।

দারুণ আক্রোশে পড়ে তার দলের ৫।৬ জনকে হত্যা তো করলামই, উপরন্তু গোবিন্দলালের মাথাটাও আনলাম নিজের হাতে কেটে। একদিন মায়ের চোখের জলে যে আগুনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই আগুনেই পাষণ্ড গোবিন্দলাল সদলবলে দগ্ধ হ'য়ে গেল।

ইতিমধ্যে তেজশঙ্করের নামে দেশ-বিদেশে আতঙ্কের সৃষ্টি হ'য়ে পড়েছিল। সরকার বাহাদুর যথাসাধ্য চেষ্টা সুরু করেছিলেন আমাকে দমন করতে। কিন্তু কোথায় পাবেন আমার সন্ধান? গভীর অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে যে বাস করে, লাঠির উপর ভর দিয়ে যে রাতের অন্ধকারে দশ বিশ ক্রোশ পথ ঘুরে আসে—তাকে ধরা সহজ নয়।

রংপুরের জমিদার দুর্গাশঙ্কর ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে ধরাকে সরা

স্থান করতো। যাদের রক্ত শোষণ ক'রে তার অত ঐশ্বর্য, সেই প্রজাদের উপর সে ভযানক অত্যাচার সুরু করলে।

লোকটা নিজে প্রচণ্ড মাতাল, তার উপরে আবার চরিত্রহীন। তার অত্যাচারে গরীব প্রজাদের জাত-মান বজায় রাখা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। অনেক স'য়ে, শেষে তারা করলে ধর্ম্মঘট।—আর যায় কোথায়? অহঙ্কারে অন্ধ জমিদার প্রজাদের উপরে হিংস্র পশুর মত আচরণ করতে লাগলো। প্রজারা একেবারে পবিত্রাহি চীৎকার সুরু ক'রে দিলে।

দলে দলে প্রজাদের উপর জমিদারের লাঠিয়ালরা লাঠি চালিয়ে দিলে। কত প্রজা মরলো, কত হ'লো সাংঘাতিকরূপে আহত। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই। বিস্তর প্রজার ঘর আগুনে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। অনেকের ক্ষেতের শস্য, গোলার ধান জমিদারের পাইকরা লুট ক'রে নিয়ে গেল। নিরীহ দরিদ্র প্রজাদের হাহাকারে আকাশ-বাতাস ভ'রে যেতে লাগলো।

বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই আমার দলবল আছে; অথচ আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না যে তারা কে? দুর্গাশঙ্করের কীর্ত্তির কথা আমার ঐ দলবলের মারফৎ আমার কানে এসে বাজ্‌লো। দারুণ পণ নিয়ে চল্লাম তার উপরে প্রতিহিংসা নিতে।

তোমরা সে কথা শুনেছ নিশ্চয়। জহুরীর ছদ্মবেশে তার বাড়ীতে উঠে দিন দুপুরেই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছি। তারপর তার অনুচরদের মধ্যে কয়েকজনকে জন্মের মত অঙ্গহীন ক'রে দিয়ে এমন ভাবে চলে এসেছি যে, কারও সাধ্য হয়নি আমার গতিরোধ করতে। আসবার সময় তাদের জানিয়ে দিয়ে

এসেছি—দুর্গাশঙ্করকে যে দণ্ড দিয়ে গেল—সে আর কেউ নয়, স্বয়ং দস্যু-সম্রাট্ তেজশঙ্কর!

এই ভাবে রাজত্ব ক'রে এসেছি এক-আধ দিন্ নয়, এক যুগ—বারো বছর। বাংলা আর বিহারের বুকের উপরে এম্নিভাবে আমি ঝড় সৃষ্টি ক'রে বেড়িয়েছি।

আমি স্পষ্ট বুঝলুম যে, ভগবান আমার অন্তরের মধ্যেই আছেন। তিনি আমার শৈশব হ'তে আমার মনে-প্রাণে যে প্রবৃত্তির উৎস ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটা তাঁরই ইঙ্গিত ছাড়া কিছুই নয়। দরিদ্র-নারায়ণের সাহায্য-কল্পে তাই আমি কঠোর পথ অবলম্বন করেছি। ভগবানেরই একাজ, আজ তিনি তা' করিয়ে নিচ্ছেন আমাকে দিয়ে—কারণ দরিদ্রনারায়ণের সেবকরূপে আমি তাঁর একজন প্রধান ভক্ত।

আমি অনুভব করলাম, আমার কর্ত্তব্যই হচ্ছে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। গত বারো বছর ধরে আমি তা একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবেই পালন ক'রে এসেছি। মায়ের সে উপদেশ আমি একটি দিনের জন্যও বিস্মৃত হইনি। মা বলেছিলেন—"দেখিস্ বাবা! নিজের জন্যে যেন কিছু করতে যাস্‌নি। নিঃস্বার্থ ভাবে যা করা যায় সেইটিই কাজ, তাতে পাপ নেই।" আমিও তাই কেবল দরিদ্রনারায়ণদের জন্যই ক'রে এসেছি অত্যাচারী ধনিকদের ধনের উপর দস্যুতা—ক'রে এসেছি শয়তানের উপাসকস্বরূপ নির্ম্মম নরপশুদের হত্যা। তাতে আমার নিজের স্বার্থের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নেই।

আমি থাকি বনে জঙ্গলে, গাছতলায় আর পাহাড়ের গুহায়। খাই নিরামিষ অন্ন, আর ফলমূল। সন্ন্যাসীর বেশে গৈরিক বস্ত্র আর রুদ্রাক্ষ পরে যখন দেশে দেশে দরিদ্রনারায়ণদের কুটীরে কুটীরে ঘুরে বেড়াই, তখন আমি তাদের সকলেরই দয়াল দাদা। আমারই নাম ক'রে আমারই দস্যুতার অর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসীরা সময়ে অসময়ে তাদের দান ক'রে থাকেন, তাই তারা সবাই আমাকে দয়ার অবতার বলেই মনে করে। কিন্তু তারা জানে না যে, আমিই সেই তেজশঙ্কর, সেই বিখ্যাত দস্যু-সম্রাট্, যার নামে সারা বাংলা আর বিহারে পড়ে গিয়েছে থরহরি কম্প।

আজ আমি নিজেই এসে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। নিজেই সেধে নিজের গলায় তুলে নিচ্ছি ফাঁসির দড়ি, তা নইলে কারও সাধ্য হ'তো না যে তেজশঙ্করকে এই পাখীর খাঁচার মধ্যে এনে পূরবে। আমি মরছি, আমার দরিদ্রনারায়ণের উপকার আরও পরিপূর্ণরূপে সার্থক ক'রে তুলতে—আত্মবলি দিয়ে!

দরিদ্রদের সেবক আমি। আমি তাদের রক্ষক, তাদের পৃষ্ঠ-পোষক। কিন্তু, আমারই জন্যে আজ তাদের সুরু হয়েছে নির্য্যাতন। তাদের যে কি দুর্গতি ভোগ করতে হ'চ্ছে, তা তুমিও নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ—কারণ, তুমি 'জেলার'।

আমার কোন সন্ধান না করতে পেরে তোমার অযোগ্য সহ-যোগীরা এই নিরীহ গরীবদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি সুরু ক'রে দিয়েছে। এই তাদের বিচার। এই তাদের ধর্ম্মজ্ঞান।

আমি তা কিছুতেই হ'তে দেব না। আমার জন্যে শত শত নিরীহ লোকের দণ্ড হয়, প্রাণ থাকতে আমি তা সহ্য করবো না;

তাদের নিষ্কৃতি যেমন ক'রেই হোক, আমাকে দিতে হবে। কিন্তু আর কোন উপায় নাই। আমি ধরা না দেওয়া পর্য্যন্ত তাদের উপরে অন্যায় জুলুম চলতেই থাকবে। তাই নিরুপায় হ'য়ে আমি নিজে এসে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, কিন্তু তাদের তো নিষ্কৃতি মিলবে।

ফাঁসি হবে, আগেই তা জানতাম। তা জেনেই ধরা দিতে এসেছি। তবে আর তাতে ভয়টা কিসের? এই ত' ভোর হ'য়ে গেছে। তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছি: আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। তারপরেই সব চুকে যাবে। একটা উৎপীড়িত প্রতিহিংসাপরায়ণ জীবনের উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে তেজশঙ্কর চলে যাবে, যেখানে তার ভগবান্ তাকে নিয়ে যান। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। দুঃখ যা-কিছু সে কেবল আমার গরীব ভাইদের জন্য। আর ত' আমি তাদের সেবা করতে পারব না! তা যাক্। তুমি এখন যাও নিজের কাজে যোগ দাও গে। অনিতাকে আমার আশীর্ব্বাদ আর সেই সঙ্গে আমার স্নেহ জানিয়ে ব'লো, তার দাদা মরবার কালেও তাকে ভোলেনি; তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে করতেই মরেছে।

মাকে আর কি বলবে? তাঁকে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিও, আর ব'লো যে, তাঁর ছেলে তাঁর উপদেশ পূর্ণমাত্রাতেই পালন করেছে। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তার নিজের জন্যে কিছুই করেনি। এতেও কি সে ভগবানের দয়া পাবে না!

তেজশঙ্করের বিচিত্র জীবন-কাহিনী সব শুনে উঠে আসবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করলুম—"কিন্তু একটি কথার জবাব দিন—এই যে আপনার আপ্রাণ চেষ্টা, কঠোর সাধনা,—এতে ক'বে দরিদ্র জন সাধারণের স্থায়ী উন্নতি আপনি কি ক'রে গেলেন? আপনার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, সামান্য যে স্বাচ্ছন্দ্যটুকু তারা পেত তাও ত' চিরদিনের মত ঘুচে যাবে!"

একটু চুপ ক'রে থেকে তেজশঙ্কর বল্লে—"তা হয়ত যাবে—হিংসার পথে স্থায়ী কল্যাণ গ'ড়ে ওঠে না, শুধু প্রতিশোধ নেওয়া যায় মাত্র। সমাজের উন্নতি না হ'লে এর মীমাংসা হবে না ভাই! সব জানি—আমি শুধু প্রচণ্ড হিংসা বৃত্তিই চরিতার্থ ক'রে গেলাম, আর সেই জন্য তার মূল্যস্বরূপ এই প্রাণটাও দিতে হ'ল—হয়ত একদিক দিয়ে খুব ভুল করেছি, কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমার ভরসা এই, ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর নূতন মানুষ হ'য়ে যারা জন্ম নেবে—তারা আমার গল্প শুনে নিজেদের শুধ্‌রে নিয়ে এমন কোন একটা উন্নত নিয়ম প্রবর্ত্তন করবে, তার ফলে ভবিষ্যতে আর কোন তেজশঙ্করকে অনর্থক প্রাণ দিতে হবে না!"

জেলখানার ঘড়িতে ছ'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই তেজশঙ্করের ফাঁসি হ'য়ে গেল।

যে দুর্দ্দান্ত দস্যুর দাপটে পুলিশের লোকদের আহার-নিদ্রা ঘুচে গিয়েছিল, তার চরম দণ্ড হওয়ায় সকলে নিশ্চিন্ত হ'ল। ফাঁসির খবরটা শুনে হাসতে হাসতে যে যার বাসায় ফিরে গেল। আমিও ফিরলুম। কিন্তু প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ

করতে লাগলাম। ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে হ'তে লাগলো যে.—আজ যে মহা অপরাধীর মত ফাঁসির মঞ্চে তার প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, সে একজন মহা পরোপকারী আত্মত্যাগী মহাবীর।

তেজশঙ্করের সেই কথাটাই আজ বার বার মনে পড়ছে—এই পৃথিবীতে নূতন মানুষ হ'য়ে যারা জন্ম নেবে—তারা করবে এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা—যার ফলে ভবিষ্যতে আর কোন তেজশঙ্কর অনর্থক প্রাণ বলি দেবে না,—তারা গ'ড়ে তুলবে স্বর্গরাজ্য, যেখানে হিংসা নেই, রাগ নেই, অভাব নেই, বৈষম্য নেই—আছে শুধু অফুরন্ত স্নেহ-প্রীতি আর ভালবাসা!

সে দিন কি সত্যই আসবে? মানুষ কি সত্যই মানুষ হ'য়ে উঠবে?

সমাপ্ত